তৃতীয় অধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে বাক্-নির্মাণ

তৃতীয় অধ্যায়

।। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে বাক্-নির্মাণ ।।

সময় প্রবাহমান। তাই দ্রুত পাল্টে যায় সময়ের ধারা। কালে কালে এই বদলে যাওয়া সময়ের নানা ঘটনা, নানা কথা লেখক শিল্পীরা তাঁদের লেখায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন — যা থেকে পরবর্তী সময়ের পাঠক পুরোনো দিনের কথা জানতে পারে। সতীনাথ ভাদুড়ীও এই সময়ের নানা চিত্রকে অঙ্কন করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। চল্লিশের দশকের অন্যান্য কথাকারদের মতো সতীনাথও তাঁর সময়কে, সময়ের রূপরেখাকে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে তুলে ধরেছেন ছোটগল্পে — যা থেকে আমরা সেই সময় পর্বের অন্দরমহলের কথা জানতে পারি। আর এই সকল কিছুর মূলেই রয়েছে ভাষা ও শৈলী। একই সময়কে নতুন ভাবে চিনিয়ে দিতে, সময়ের নতুন তথ্য জানাতে সতীনাথের ভাষা ব্যবহার অনন্য। সতীনাথ জীবনকে দেখে, গভীরতা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে জীবনের বিচিত্র স্বাদ পেয়ে বারে বারে বিস্মিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আর সেই বিস্ময়ের উদ্বোধনকে অনিবার্য ভাবে স্বকীয় ভাবনায়, স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন তাঁর অসাধারণ ভাষা জ্ঞানের ব্যবহারের মাধ্যমে। খণ্ড খণ্ড বাক্য, টুকরো টুকরো শব্দকে শব্দের পরে সাজিয়ে, বাংলা ভাষার সঙ্গে বিহারী ও হিন্দি ভাষার সঠিক সংযোগে সতীনাথ যেভাবে ভাষার ঐশ্বর্য নির্মাণ করেছেন তা সকল যুগের পাঠককেই অনায়াসে বিস্মিত করতে পারে। অন্তর্মুখী-ধীর-স্থির-গম্ভীর স্বভাবের এই মানুষটির মধ্যে যে এত ঐশ্বর্য লুকিয়ে ছিল তা তাঁর সাহিত্য পাঠ না করলে বোঝা সম্ভব নয়। কখনো নিজেকে আড়াল রেখে, কখনো নিজেকে প্রকাশ করে তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলিকে নিয়ে আপন মনের নিভৃতে ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে এক একটি গল্পের দেহাবয়ব — বাস্তব অভিজ্ঞতার সত্য উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ।

সতীনাথের লেখার শৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন — গতানুগতিকতার প্রতি চপেটাঘাতের মতো, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বেচ্ছায় প্রবাস জীবনকে বরণ করে নেওয়া এই মহান সাহিত্যিকের অনলস সাহিত্য চর্চা — সাহিত্য সৃষ্টিকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলেই অনায়াসে উঠে আসবে তাঁর ভাষা ব্যবহার ও বাক্ নির্মাণের অপূর্ব শৈলী। এটা বোধ হয় বলা বাহুল্য যে, সাহিত্য সৃষ্টির মূল উপাদান ভাষা। আপাতভাবে বলতে গেলে যা আমাদের মুখের ভাষা বা আমরা (বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠী) সাধারণত যে বাংলা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি সেই Standard Coloqual Language বা আদর্শ মান্য চলিত ভাষাতেই রচিত হয় আধুনিক যুগের কথা সাহিত্য। যে সকল লেখক বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এই বাংলা ভাষাকেই তাঁদের সৃষ্টির প্রকাশ

রূপের জন্য ব্যবহার করেছেন। তাই সাধারণ ভাবে হয়ত আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে যে — একই বাংলা ভাষায় লেখা বিভিন্ন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কিবা বৈচিত্র্য থাকতে পারে? কিন্তু যারা বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক এবং যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে নিয়মিত চর্চা করে থাকেন, তারা অবশ্যই কম-বেশি অবগত আছেন যে, একই মাধ্যমের ভাষা ব্যবহার করেও এক-এক জন সাহিত্যিক ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের সাহিত্য রচনা করে থাকেন। তেমনই একজন সাহিত্যিকেরই একাধিক সাহিত্য সৃষ্টিকে বিচার করলেও দেখা যায় ভাষা ব্যবহারের নানা বৈচিত্র্যকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল আমরা যে সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে আলোচনায় রত হয়েছি তিনি অর্থাৎ সতীনাথ ভাদুড়ী জন্মসূত্রেই বাঙালী হয়েও প্রবাসী। কাজেই যে মানুষটি জন্ম থেকেই তাঁর মাতৃভাষার পাশাপাশি আরও একটি প্রাদেশিক ভাষা হিন্দি এবং বিহারের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাকে সমান ভাবে শুনে শুনে বড় হয়ে উঠেছেন, তিনি যখন সাহিত্য রচনা করছেন তখন যে, দুটো ভাষাই তাঁর মধ্যে সমান ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তা বলাই বাহুল্য। আমরা আরও জানি যে, বিদ্যাচর্চায় উৎসাহী সতীনাথ একাধিক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাই বাংলা বা হিন্দি ছাড়াও ইংরেজী, ফরাসী, লাতিন প্রভৃতি ভাষাও তাঁর সাহিত্যে কম বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই সব মিলিয়েই সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের ভাষা নির্মাণ হয়েছে খুবই স্বতন্ত্র, প্রায় নজিরবিহীন। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের ভাষা ব্যবহার তথা বাক্‌নির্মাণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে — সতীনাথ যেন ছিলেন একজন মৃৎশিল্পী। মৃৎ-শিল্পীরা যেমন একই মাটির তালকে ব্যবহার করে নিজের হাতের বিশেষ কৌশলে নির্মাণ করে অপূর্ব সুন্দর প্রতিমা বা অন্য কোনো মূর্তি, তেমনি সতীনাথও ভাষার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার কৌশলে তাঁর গল্পের যে অবয়ব তৈরী করেছেন তা অবিসংবাদিত-অভূতপূর্ব।

এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য — সতীনাথের ছোটগল্পের বাক্-নির্মাণ। বাক্-নির্মাণ আলোচনা করতে গেলে যে কয়েকটি বিষয় অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে তা হল গল্পের প্লট নির্মাণ, কাহিনী বিন্যাস, কাহিনীর উপস্থাপন রীতি, চরিত্র সৃষ্টিতে ভাষার সুকৌশল ব্যবহার বা ভাষা রীতি, গল্পের পটভূমি-পরিবেশ প্রভৃতি। এছাড়া ভাষা ব্যবহারকে কেন্দ্র করে উঠে আসে আরও কয়েকটি বিষয় — ভাষার প্রয়োগ শৈলী, উপমা-অলংকার, চিত্রকল্পের ব্যবহার, শব্দচয়ন, শব্দনির্বাচন, শব্দনির্মাণ প্রভৃতির মধ্য দিয়েও লেখকের লেখার শিল্প রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাহিত্য জীবন নির্ভর, কিন্তু কেবলমাত্র বাস্তবজীবন কখনই সাহিত্য নয়। কারণ জীবনের কোন নির্দিষ্ট প্লট থাকে না; আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাহিনীকে গ্রন্থিবদ্ধ করতে অবশ্যই প্রয়োজন হয় একটা বিশেষ প্লটের। আর সাহিত্যিকদের প্রধান কাজ হল — বাস্তবজীবনের ঘটনাকে একটা নির্দিষ্ট ছকে ফেলে প্লট নির্মাণ করে কাহিনীকে সুপরিকল্পিত ভাবে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সুগঠিত প্লটই সুন্দর সাহিত্যের জন্ম দেয়। যদিও অনেক সময় প্লটবিহীন গল্প-উপন্যাসের কথা শোনা

যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বোধহয় প্লটবিহীন কোন সাহিত্য হতে পারে না। আসলে লেখক বা সাহিত্যিক নিজস্ব মেধা-মননশীলতা-পারদর্শিতায় কখনো কখনো প্লটকে কাহিনীতে এমন ভাবে ব্যবহার করে থাকেন যে আপাতদৃষ্টিতে পাঠকের অনেক সময় মনে হয় গল্প বা উপন্যাসটিতে হয়ত কোন নির্দিষ্ট প্লট নেই।

উপন্যাসের মতই ছোটগল্পেও প্লট অপরিহার্য। যদিও ছোটগল্প পূর্ণাঙ্গ জীবনের গল্প নয় — জীবনের খণ্ড বা অংশ বিশেষ। তবুও জীবনের ছোট-ছোট বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে পর পর বসিয়ে দিলেই তা কখন ছোটগল্প হয়ে উঠবে না। সাহিত্যের নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে তাকে একটা প্লটের মধ্যে ফেলে কাহিনীকে পরিণতি দান করলে তবেই তা প্রকৃত ছোটগল্প হয়ে ওঠে। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও প্লটের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তাঁর অধিকাংশ গল্প বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্মত। তবুও নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কীভাবে শিল্পরূপ দান করে এক একটি অসাধারণ ছোটগল্প রচনা করেছেন তা দেখে নিতেই গবেষণা পত্রের এই অধ্যায়ে আমরা সতীনাথের ছোটগল্পগুলিকে আরেকবার পর্যালোচনা করে দেখব।

বাক্‌নির্মাণের আলোচনায় প্রথমেই চলে আসে প্লট তথা কাহিনী গ্রন্থনের কথা। কোন কোন সমালোচক যদিও বলেছেন ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্লট উপন্যাসের মতো অপরিহার্য নয়। কিন্তু আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ছোটগল্পের উৎস মুখের দিকে চোখ ঘোরালে দেখতে পাই সেখানে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যেসব প্লটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা হল — i) সিঁড়ি ভাঙা প্লট বা স্টেয়ার স্টেপ প্লট, ii) রকেট প্লট, iii) সরল বা একরৈখিক প্লট iv) জটিল প্লট v) বৃত্তাকার প্লট। কাজেই ছোটগল্পে প্লটের অপরিহার্যতার কথা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হয়। রবীন্দ্রনাথও বাংলা ছোটগল্পে প্লটের ব্যবহার করেছেন। যার অনবদ্য উদাহরণ তাঁর 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি। আর ছোটগল্পে প্লটের ব্যবহারে সতীনাথ ভাদুড়ীও ছিলেন যথেষ্ট সচেতন।

বাক্ নির্মাণের আলোচনায় যে বিষয়টি অনিবার্য ভাবেই এসে যায় তা হল ভাষাশৈলী বা ভাষার ব্যবহার। আর এই বিষয়ে সতীনাথ ছিলেন দক্ষ শিল্পী। বিষয়ের প্রয়োজনে ভাষার ব্যবহার যে কীরকম হতে পারে সতীনাথের গল্পগুলি পাঠ করলে তা বোঝা যায়। তাঁর ভাষা প্রয়োগ দেখে মনে হয় তিনি যেন অস্থি বিদ্যা শিক্ষার জন্য শবদেহকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। তাঁর গল্পে ব্যবহৃত ভাষা কখনোই বক্তব্য বিষয়কে অযথা ভারাক্রান্ত করেনি, বরং ভাষার সুকৌশল প্রয়োগে চরিত্রগুলি পাঠকের সামনে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রের প্রয়োজনেই তিনি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কোথাও কোথাও তাঁর ভাষা একটু ওজস্বী-গুরুগম্ভীর মনে হয়, তার পেছনেও রয়েছে চরিত্রের চাহিদা। আর একটি বিষয় না বললে সতীনাথ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় — তা হল সতীনাথের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ নয়, প্রান্ত বিহার। আর অবাঙালী পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষটির

রচনায় স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেছে বেশ কিছু হিন্দি শব্দ বা বিহারী ভাষা-শব্দ। তবে একথাও ঠিক যে, তিনি অপ্রয়োজনে অযথা হিন্দি শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করে পাঠককে সমস্যায় ফেলেন নি। তাঁর হিন্দী শব্দ ব্যবহারের কারণ — যে চরিত্রগুলি নিয়ে তিনি গল্প লিখছেন তারা অধিকাংশ বিহারী জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের চরিত্রকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতেই অনিবার্য ভাবে সতীনাথকে তাদের মুখে বসাতে হয়েছে কিছু হিন্দি শব্দ কিংবা হিন্দি বা বিহারী ভাষা — যা একান্ত ভাবেই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

গবেষণা পত্রটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সতীনাথের ছোটগল্পের শ্রেণী বিভাজনকে দেখিয়েছি। এই অধ্যায়ে আমরা সেই এক একটি শ্রেণীকরণের মধ্যে যে যে গল্পগুলি রয়েছে কীভাবে সেগুলির বাক্ নির্মিতি হয়েছে, কীভাবে শব্দপ্রয়োগ, শব্দচয়ন, বাক্যের মধ্যে শব্দ ব্যবহারে চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে এবং সর্বোপরি ঘটনা পরিবেশ পরিস্থিতি সন্নিবেশিত হয়ে গল্পগুলি শিল্প সার্থক হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করব। আমরা প্রথমেই শ্রেণীকরণ অনুযায়ী রাজনীতিমূলক গল্পগুলির তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে বাক্ নির্মাণ ও শিল্পরূপকে ধরার চেষ্টা করব।

রক্তে রাজনীতির বীজ নিয়ে জন্মগ্রহণ না করলেও সতীনাথের জীবনে ও সাহিত্যে 'রাজনীতি' শব্দটির প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। একদিন কাউকে আগাম কিছু না জানিয়ে, পরিবার-পরিজন, আত্মীয় বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলকেই অপ্রত্যাশিত ভাবে অবাক করে রাজনীতির জগতে যোগদান করা, দীর্ঘ নয় বছর (১৯৩৯-১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) সেখানে সক্রিয় ভাবে কাজ করে যাওয়া এবং তার পর আবার পূর্বের মতই রাজনীতি বা দলের লোকেদের সবচেয়ে বেশি অবাক করে রাজনীতি থেকে চির নির্বাসন নেওয়া — এই পুরো বিষয়টার মধ্যে কাজ করে গেছে সতীনাথের তীক্ষ্ণ-সুগভীর চিন্তা ভাবনা। যার জের তাঁর সাহিত্যেও সমান ভাবে পড়েছে। তাই সতীনাথের রাজনীতিমূলক গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে যা পাঠককে মুগ্ধ করে এবং আকর্ষণ করে তা হল তাঁর বিচক্ষণী দৃষ্টি। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির মধ্যে কে বা কারা ভণ্ড, মুখোশধারী, আত্মস্বার্থ লোভী, ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের প্রতিনিয়ত চেষ্টায় রত, তার স্পষ্ট-স্বচ্ছ ছবি এঁকে তাদের মুখোশটাকে পাঠকের সামনে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছেন। অপর দিকে আবার যে মানুষগুলি সংখ্যায় খুব কম হলেও নিজেদের প্রাণের-মনের তাগিদে বা সত্যিকারের দেশপ্রেম বা দেশের প্রতি কর্তব্যবোধের টানে রাজনীতির জগতে যোগদান করেছেন এবং আত্মত্যাগ করেছেন তাদের কথাও পাঠককে জানিয়েছেন। পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সেই সকল মহান দেশপ্রেমী বা রাজনীতিবিদ্দের উদার-ত্যাগী চরিত্র ধর্মকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সতীনাথ এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের মানুষগুলি সম্পর্কে কোথাও আলাদা করে তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করেননি বা তুলে ধরেননি। প্রত্যেকটি গল্পেই চরিত্রগুলির কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই লেখক স্পষ্ট করে তুলেছেন

তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে। শঠ, ভণ্ড বা বিড়াল তপস্বী মুখোশধারী রাজনীতিবিদ্‌দের নিয়ে লেখা গল্পগুলি হল — 'গণনায়ক', 'চরণদাস এম. এল. এ', 'পরকীয় সন-ইন-ল', 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' প্রভৃতি। আর উল্টো দিকে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক চরিত্রকে নিয়ে লেখা গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'আন্তর্জাতিক'।

উপন্যাসের বিষয়োপযোগী একটি কাহিনীকে কীভাবে ছোটগল্পের পরিসরে বেঁধে সার্থক একটি ছোটগল্প রচনা করা যায় তার অনবদ্য উদাহরণ সতীনাথের 'গণনায়ক' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) গল্পটি। 'গণনায়ক' গল্পটি সতীনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গণনায়ক'-এর নাম গল্প। প্রথম পুরুষে বর্ণিত এই গল্পটিতে ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্‌কালে দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার যে পটভূমি তৈরী হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে একদল মুনাফালোভী-শঠ-প্রবঞ্চক-ভণ্ড দেশনেতাদের চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। বিবৃতিধর্মী এই গল্পটিতে প্রান্ত বিহারের একটি জেলা পূর্ণিয়া ও পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি জেলা দিনাজপুরের অন্তর্গত গোপালপুর থানা ও শ্রীপুর থানাকে কেন্দ্র করে মুনাফালোভী ভণ্ড মেকি দেশনেতাদের প্রবঞ্চনা-শঠতা নিয়েই গল্পের প্লট নির্মাণ করেছেন। বৃত্তাকার প্লটের ব্যবহারে সতীনাথ 'গণনায়ক' গল্পটির কেন্দ্রিয় বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। গল্পের শুরু থেকেই সুকৌশলে প্লটের সার্থক ব্যবহারে গল্পকে তার গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন। সতীনাথের গল্পের যেকোনো বিষয়ের আলোচনার এটা অবশ্যই স্মর্তব্য যে — তাঁর গল্পগুলি সত্যলব্ধ বা বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত। তাই তাঁর গল্পের বাক্‌-নির্মাণ বা শিল্পরূপের বিচারে এই বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হয়।

'গণনায়ক' গল্পের সূচনায় লেখক বলেছেন — ''লেখাগুলি বিবরণ মূলক। বিবরণের যথাতথ্য সামান্য পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, — পাছে প্রাণহীন প্রতিলিপি হইয়া দাঁড়ায়, সেই ভয়ে এবং আরো কয়েকটি কারণে।''[১] কাজেই সতীনাথ যখন নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর গল্পটি বিবরণধর্মী তখন গল্পটি শিল্পরূপ নির্মাণে পাঠকের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সতীনাথ যে স্বতন্ত্র শ্রেণীর লেখক তার প্রমাণ এই বিবরণ ধর্মী গল্প রচনা যা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে একেবারে নতুন বললে বোধ হয় খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না। সতীনাথের গল্পের শিল্পরূপ বা বাক্‌-নির্মাণ তার গল্পের প্রয়োজনে। যেমন 'গণনায়ক' গল্পটির উপস্থাপনরীতি একেবারেই চমকপ্রদ নয় বরং বলা যেতে পারে বেশ খানিকটা নিস্তরঙ্গ-উত্তেজনাহীন ভাবেই সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়েই লেখক গল্পটির সূচনা করেছেন। যদিও গল্পে তাঁর বক্তব্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর, কিন্তু তার জন্য তিনি কোনো বিশেষ রীতি অবলম্বন করেন নি। সাধারণ বিবরণধর্মিতার মধ্য দিয়ে গল্পের সূচনা করে একেবারেই অনাড়ম্বর ভাবে এগিয়ে গেছেন লক্ষ্য বা পরিণতির দিকে। এই গল্পটিতে সতীনাথের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মুনীমজী বা মুসলিম ইজারাদারের মতো মুনাফালোভী, প্রবঞ্চক, নীতি-আদর্শ-বর্জিত মুখোশধারী ব্যবসায়ী মানুষের মুখোশের আড়ালের

নগ্ন চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তোলা। আর বলা বাহুল্য, সতীনাথ তাঁর উদ্দেশ্যে যথার্থ ভাবেই সফল হয়েছেন। সামান্য দু-একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই তিনি পাঠককে চিনিয়ে দিয়েছেন মুনীমজীর আসল চরিত্রটিকে।

তাই 'গণনায়ক' গল্পে প্রথম থেকেই সতীনাথ তাঁর পাঠককে সামান্য সামান্য ঘটনা ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন মুনীমজী বা ইজারাদারের মত শঠ্-প্রবঞ্চক চরিত্র দুটিকে। যারা রাজনীতিকে বা যেকোন সামাজিক পরিস্থিতিতে যেকোন ঘটনা ধারার মধ্য থেকে যেভাবেই হোক নিজের লাভের অঙ্কটুকু বুঝে নিতে তৎপর হয়ে ওঠে, সেই মুনীমজী বা ইজারাদারের ভালোমানুষীর মুখোশকে পাঠকের সামনে টেনে ছিঁড়ে ফেলে তাদের নগ্ন-ঘৃণ্য চেহারাটা স্পষ্ট করে তুলেছেন। মুনীমজী বা ইজারাদারের সঙ্গে সঙ্গে 'গণনায়ক' গল্পে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে বেশ কিছু সাধারণ মানুষ বা আমজনতার কথা। যারা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে প্রতিবেশী ও সুজন জ্ঞানে সহাবস্থান করে এসেছে। এই সহজ সরল মানুষগুলি কীভাবে মুনীমজী বা ইজারাদারের মত মানুষের কাছে নিজেদের সমাজ সংসার জীবনের গতিপথে অনেক অনেক প্রত্যাশা, অনেক অনেক ভরসা, অনেক আশার আলো দেখার জন্য সবকিছু উজাড় করে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে, উদ্বাস্তু হয়ে পথে বসেছে তারও চিত্র সতীনাথ এই গল্পে অঙ্কন করেছেন। দু-একটা উদাহরণে তা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আরুয়াখোয়ার হাটে গিয়ে মুনীমজী যখন তার জানা দেশভাগ সংক্রান্ত বিশেষ খবর জনতাকে জানাতে থাকে তখন তাদের মনের অবস্থা কিরকম ছিল সতীনাথ তার যে ভাষা চিত্র অঙ্কন করেছেন তা দেখে নেওয়া যাক — ''হাট আজ আর জমলো না। লোকের মুখে মুখে মুনীমজীর খবর হাটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাউজীর দোকান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সকলেই মুনীমজীর নিজের মুখ থেকে খবর শুনতে চায়। নানা প্রশ্নে সকলে তাকে উদ্‌ব্যস্ত করে তোলে। দিনাজপুর আর মালদার হিন্দু হাটুরেরা দল বেঁধে আসে তার সঙ্গে পরামর্শ করতে ..... মালদা দিনাজপুরের হিন্দুদের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ একান্তে কথাবার্তা বলেন। এই বিপত্তির সময় মুনীমজীর স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতিতে তারা মনে বল পায়।''[২]

গল্পের একদম শুরুর দিকেই পাঠক জানতে পারে মুনীমজীর সামাজিক অবস্থান ও তার গুরুত্বকে। ''মুনীমজী আজকে খুব খুশি আছেন। তিনি যাওয়া মাত্র সকলেই তার কাছে দেশের 'হালচাল' জিজ্ঞাসা করেন। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, এমনকি কন্‌সী এল. পি স্কুলের গুরুজী পর্যন্ত তাঁর কাছে খবর জিজ্ঞাসা করেন। একে অতবড় গোলার লেখাপড়া জানা মুনীম; তার উপর তার মালিকের বাড়িতে 'বিজলী' -তে খবর আনবার কল আছে! ... কাজেই মুনীমজীর কথার গুরুত্ব স্থানীয় লোকেদের কাছে অনেকখানি।''[৩] সেই সঙ্গে সতীনাথ পাঠককে এটাও জানিয়ে দেন যে মুনীমজী একজন চোরাকারবারের হোতা। দেশ ভাগের একদম প্রাক্ মুহূর্তে চারিদিকে যখন চরম উত্তেজনাময় পরিবেশ পরিস্থিতি তখন

মুনীমজী সুধানী গোলা থেকে চোরা চালানের চিনির বস্তা নিয়ে আরুয়াখোয়ার ব্যবসায়ী সাউজী এবং হাটের ইজারাদারের কাছে সেই চিনি বেশি দামে বিক্রি করে। মুনীমজীর অর্থ উপার্জনে এই বিশেষ অসাধু উপায়ের কথা সতীনাথ এমন কৌশলে পাঠককে জানিয়েছেন, যেখানে তাঁর বর্ণনা থেকে পাঠক একটু একটু করে আন্দাজ করে নিতে পারে মুনীমজী চরিত্রটি সম্পর্কে। গল্পের শুরুর দিকে ছোট্ট করে জানিয়ে রাখেন আরুয়াখোয়ার বর্তমান পরিস্থিতি — "কেবল গত বছর কয়েক থেকে গোপালপুর থানার আরুয়াখোয়ার হাট জমে উঠেছে। যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির দৌলতে — বিহার আর বাংলার মধ্যের বে-আইনী জিনিসের কেনা বেচায়।"[৪] এরপরই মুনীমজীর পরিচয় দিয়ে তার কাজ কারবারের কথা পাঠককে জানান। "সুধানীগোলার জহুরমল ডোকানিয়ার 'মুনীম' (গোমস্তা) এক শনিবারের রাতে আরুয়াখোয়া হাটে গাড়ী নিয়ে যচ্ছেন। চিনির বস্তাগুলির উপর ত্রিপল বিছানো।"[৫] মুনীমজীর শঠ্-চতুর-প্রবঞ্চক চরিত্রের পরিচয় পাঠকপান মুনীমজীর একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে। সুধানীগোলা থেকে আরুয়াখোয়ার হাটে চোরা কারবারের চিনি নিয়ে যাওয়ার সময় মুনীমজী তার গাড়োয়ান বিলট্কে সাবধান করে বলেন — "দেখিস রাতে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কি নিয়ে যাচ্ছিস, তা হলে বলিস আলু; আলুর বোরাটা সম্মুখে আছে তো?"[৬]

মুনীমজীর চরিত্রের আরেকটি দিক বা মুখ্য দিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও, কেবল মাত্র রাজনৈতিক উত্তেজনার ও দেশভাগ জনিত উত্তাল-অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে গণনায়কের মুখোশ পরে সাধারণ সহজ-সরল মানুষগুলির সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে, তাদের মনে মিথ্যে আশা কিংবা ভয়ের সঞ্চার করে, তাদেরকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করে, তাদের সর্বনাশের ব্যবস্থা করে তার মধ্য দিয়ে নিজের মুনাফা লাভ করা, নিজের আত্ম সার্থকে চরিতার্থ করা, নিজেকে গণনায়ক বলে চিহ্নিত করা। মুনীমজী চরিত্রের দুটি ভিন্ন রূপের ছবি সতীনাথ যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা কোন বড় মাপের শিল্পী ছাড়া সম্ভবপর ছিল না। অর্থাৎ মুনীমজীর চরিত্রে অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক দুটি বিপরীত রূপের বর্ণনা এমন ভাবে করেছেন যেখানে গল্পের চরিত্রেরা কেবলমাত্র মুনীমজীর বাহ্যিক মুখোশ পরা ভালো মানুষ রূপটাকে দেখতে পায়। কিন্তু পাঠক মুনীমজীর দুটি রূপকেই স্পষ্ট ভাবে দেখে আর আতঁকে ওঠে।

এখানে মুনীমজী যেন দুটি সত্তায় বিভক্ত। তার প্রত্যেকটি কাজের পেছনে থাকে একটা গূঢ় মতলব আর ওপরে থাকে একটা লোক দেখানো বাহ্যিক ভালোমানুষী রূপ; যেটা দেখে আরুয়াখোয়ার সাউজী থেকে শুরু করে হাটে আসা সাধারণ হিন্দু-মুসলমান জাত-পাত নির্বিশেষে সকলেই তাকে 'বিশ্ব বিশ্রুত দেশনায়ক'-এর আসনে বসায়। মুনীমজীর এই মুখ আর মুখোশের বর্ণনা দিতে সতীনাথ যে বাক্যের ব্যবহার করেছেন তা উদ্ধৃত হল — মুনীমজী সম্পর্কে আরুয়াখোয়ার

সাউজী থেকে সাধারণ মানুষগুলোর বদ্ধমূল ধারণা — "... মুনীমজী সাচ্চা আদমী; হিঁদুর ছেলে আর এদিককার মছলী খাওয়া হিঁদু নয়। রাজপুতানা, বীরের দেশ, - রাজা আর শেঠের দেশ, তারা মুসলমানদের কাছে একদিনের জন্যও মাথা নীচু করেনি। তিনি মাগনা গাড়ী নেবেন না; বেগার গাড়ি নিতে পারে মুসলমান ইজারাদার। মুনীমজী ওয়াজিব ভাড়া দেবেন তোমাদের।"[৭] এই হল মুনীমজীর মুখোশ পরা রূপ, যে রূপ দেখিয়ে মুনীমজী সকলের বিশ্বাস অর্জন ক'রে তাদের চোখে হয়ে উঠেছেন আসল 'গণনায়ক'। আর মুনীমজীর প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় — যখন তিনি দেশভাগ জনিত অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ঘটনার পরিস্থিতিতেও নিজের আর্থিক লাভের হিসেব করে সকলের বিশ্বাসের অমর্যাদা ক'রে, তাদেরকে ঠকিয়ে একই পতাকা দুবার করে বিক্রি করেন সাধারণ মানুষের কাছে এবং তারপর 'কমিশনের রায়' বেরনোর পরে মুনীমজী ওপারের সকল লোককে বলেন যে — "সকালে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে দিয়ে দিও। আমি গর্ভমেন্টের কাছে জমা করে দেব হিন্দুস্থানে পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ রাখা বারণ।"[৮] এই চাল চেলে মুনীমজী তার পূর্বে বিক্রি করা পাকিস্তানের ফ্ল্যাগগুলি অছিমদ্দীদের কাছ থেকে নিয়ে নেন, আর মনে মনে ভাবেন — "এগুলি নিয়ে কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। পোড়া গোঁসাইয়ের খালি বাড়িতে উঠবেন, তার জমিটমিগুলো একবার দেখেও আসবেন, সেখানে বেচতে হবে পাকিস্তান ঝাণ্ডাগুলো। আর সেখানে জোগাড় করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থান পতাকাগুলি। একই জিনিস দু'দুবার করে বেচবেন। তিনি হিসেব করেন সব মিলিয়ে তাঁর কত হল।"[৯] এরপর পাঠকের মুনীমজীর দুমুখো চরিত্রকে বুঝে নিতে আর অসুবিধে হয় না। সতীনাথ ধূর্ত, সুবিধাবাদী, মুনীমজীর চরিত্রকে যে ভাষা চিত্রের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে তুলেছেন তাতে তাঁর মুন্সীয়ানারই পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পটিতে আমরা মুনীমজীর চরিত্রের দুটো দিক দেখতে পাই। একদিকে আরুয়াখোয়া ও সুধানীগোলার মানুষগুলোর চোখে মুনীমজী ভগবান বা দেবতা স্বরূপ। এখানকার সহজ-সরল নিরীহ মানুষগুলো মুনীমজীর মুখের কথাকে বেদবাক্যের মতো অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। আর তাদের বিশ্বাস নিয়ে ছেলেখেলা করেন মুনীমজী। এদের অন্ধ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে নিজের আখের গোছাতে মুনীমজী নানা ফন্দি আঁটে। তাই দেখা যায়, আরুয়াখোয়ার হাটে গিয়ে হাটসুদ্ধ লোককে চমকে দিতে মুনীমজী একদম উত্তেজনাহীন ভাবে - উদ্বেগহীন গলায় বলেন — 'আর কী, দিনাজপুর জেলা তো পাকিস্তান হয়ে গেল।' এই নিরুত্তাপ-নিরুদ্বেগ গলায় কথাগুলি বলে মুনীমজী আড়চোখে দেখে নেন সম্মুখের লোকগুলোর অবস্থা এবং তাদের উদ্বেগ-ভয় মিশ্রিত-আশঙ্কা জনিত মুখগুলো দেখে মুনীমজী মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। সতীনাথ মুনীমজীর চরিত্র আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন তার কিছু স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে। একদিকে যখন মুনীমজীর কথায় বিশ্বাস করে শ্রীপুর আর গোপালপুর থানার অন্তর্গত গ্রামের লোকেরা ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবার ভয়ে-আশঙ্কায়-আতঙ্কে

দিন কাটাচ্ছে তখন মুনীমজী ভাবেন পাকিস্তানের পতাকাগুলি নিয়ে "কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। ..... সেখানে বেচতে হবে এই পাকিস্তান ঝাণ্ডাগুলো। আর সেখানে যোগাড় করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থান পতাকাগুলি।"[১০] একই পতাকা দুবার করে বেচে নিয়ে লাভের অঙ্কের হিসেব করে নেয় মুনীমজী। আর অন্যদিকে দেশভাগের বিষবাষ্পে পোড়া গোঁসাইয়ের মতো সাধারণ মানুগুলো যখন ভিটে-মাটি হারা হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে যায় তখন এই মুনীমজী তাদের কাটা ঘায়ে মলম লাগাতে ক্যাম্প খুলে বসে লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করেন। যদিও সেখান থেকেও নিজের মুনাফা বুঝে নিতে ভুল হয় না মুনীমজীর। অতি সাধারণ-সহজ-সরল মানুষগুলো যখন মুনীমজীর মুখোশধারী রূপটিকে দেখে শ্রদ্ধায়-কৃতজ্ঞতায় বলে ওঠে — 'মুনীম সাহেব কী জয়!' তখন শঠ-প্রবঞ্চক মানুষটি ভাবে 'একটি খদ্দরের টুপি আগেই কিনে রাখলে, বোধ হয় আর একটু সুবিধে হত।'

মুনীমজীর মতই একই ভাবে সতীনাথ এই গল্পের আরেকটি চরিত্রকেও তার শঠতা, ধূর্ততার মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। আরুয়াখোয়ার হাটে ইজারাদার সাহেবও মুনীমজীরই আরেকটা প্রতিকৃতি মাত্র। তিনিও দেশ ভাগের উত্তাল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় মুসলমানদের উস্‌কে দেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে — "চারিদিকে হিন্দুদের বস্তি। সকলে খুব সাবধানে থাকবে। রাতে পালা করে জাগবে। কিসানগঞ্জ ডিভিসন হিন্দুস্থানে গেলেই হল। এর আমি বিহিত করছি। খবর এখনও সঠিক পাওয়া যায়নি। ওই মুনীমটার কথায় বিশ্বাস কি?"[১১] মুনীমজীর মতই ইজারাদার সাহেব মুসলমানদের কাছে নিজেকে গণনায়ক প্রতিপন্ন করতে মিথ্যের ফুলঝুরি ছোটান। হাটে উপস্থিত মুসলমানদের শান্ত করতে করতে বলেন — "আরে মিয়া লাটসাহেবের কথাও বদলায় — ঠেলায় ফেলতে পারলে। আমি আজ রাতেই যাচ্ছি সদরে। পঁচিশ টাকা চাঁদা নিয়ে গেল জেলা পাকিস্তান কনফারেন্সে — সদর সাহেব কত রকমের কথা বললেন, আর চলে গেলেই হল এ জেলা হিন্দুস্থানে।"[১২] একদিকে মুনীমজীকে সকলের সামনে তাচ্ছিল্য করে বলে ঐ মুনীমটার কথায় বিশ্বাস কি, আবার পরক্ষণেই সেপাই পাঠিয়ে মুনীমজীকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে এসে ব্যবসা বাণিজ্যের লাভ লোকসান বুঝে নিতে চেষ্টা করেন — "আমার এ হাট এবার গেল। যাক সেতো বরাতে যা আছে হবেই। এসব তো এখনও অনেককাল চলবে, এখন কাজের কথা হোক। আজ ক'বোরা চিনি এনেছ?"[১৩]

এই ভাবেই নিরাসক্ত-ভাবলেশ হীন-আপাত সহজ-সরল ভাষার ব্যবহারে সতীনাথ 'গণনায়ক' গল্পের মূল বিষয়টিকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছেন। আর এখানেই একজন বিদগ্ধ শিল্পীর ভাষা-জ্ঞানের সুনিপুণ পরিচয় পাওয়া যায়।

'গণনায়ক' গল্পে সতীনাথ যেমন দেখিয়েছেন সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও সুযোগ বুঝে সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে মুনীমজী বা ইজারাদারের মত অসাধু ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষেরা গণনায়কের মুখোশে দেশ ও দেশের মানুষকে দিনের পর

দিন ঠকিয়ে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে, আর নিজেদের সামাজিক-আর্থিক অবস্থানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলছে। তেমনি 'চরণদাস এম-এল-এ', বা 'পরকীয় সন-ইন-ল' গল্পগুলিতে দেখিয়েছেন অর্থ-প্রতিপত্তি-ক্ষমতার জোরে কীভাবে চরণদাসের মত চতুর এবং সাহেবরামের মত প্রায় মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এম. এল. এ বা মন্ত্রী হয়ে উঠে, নিজেদের অস্তিত্বকে বহাল রাখতে কত রকমের দুর্নীতি-নোংরা রাজনীতি করে যায় এবং চূড়ান্ত মূর্খতা ও নির্লজ্জতার পরিচয় দেয়।

'চরণদাস এম-এল-এ' (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে সতীনাথ লোভী-স্বার্থপর চরণদাস চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে চিনিয়ে দিয়েছেন। সরল রৈখিক প্লটের লেখা এই গল্পের কাহিনী বিবৃত হয়েছে প্রথম পুরুষে। রাজনৈতিক পটভূমিতে লেখা এ গল্পটিতে সতীনাথ ব্যঙ্গাত্মক রচনাভঙ্গিতে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন ক্ষমতালোভী, শঠ, প্রবঞ্চক রাজনৈতিক নেতাদের আসল চরিত্রটিকে। যারা রাজনীতিকে নিজের জীবনের উত্তরণের সোপান হিসাবে ব্যবহার করে নিজেকে প্রতিপত্তিশালী করে তোলে। তবে এ গল্পে চরণদাস ছাড়া অন্যান্য আর যে কয়েকটি চরিত্র আছে তাদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ চরণদাসের চরিত্রকে সঠিক ভাবে চিনেছে এবং সময় সুযোগ মত চরণদাসকে সেই অপ্রিয় সত্য মনে করিয়েও দিয়েছে। চরণদাস ভোটে দাঁড়িয়ে জিতে এম. এল. এ. হবার পরই নিজের গ্রাম তথা ভোট কেন্দ্র ছেড়ে ভোটার ভোটারীদের দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতি পূরণ না করেই নিজের পরিবার নিয়ে রাজধানী দিল্লীতে চলে যান সরকারী আবাসনে থাকবার জন্য। তারপর বিনা খরচায় সেখানকার বিলাস বহুল জীবনাভ্যাসে নিজেকে পুরোপুরি অভ্যস্ত করতে করতে প্রায় ভুলেই যান নিজের ভোট-কেন্দ্রের কথা। কিন্তু এম. এল. এ. চরণদাসের টনক নড়ে পুনরায় ভোটের সময় এগিয়ে এলে। চরণদাসের এই টনক নড়ার প্রকৃত কারণ সতীনাথ সূক্ষ্ম ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিমায় যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে পাঠক মাত্রই তাঁর কুশলী দক্ষতায় মুগ্ধ হবে — "সেই মায়লেজী এসেছেন তার পুরনো অফিসে। পার্টি অফিস। তার সেকালকার কর্ম কেন্দ্র। ... ফ্যাসাদ! লটারীর টিকিট না কিনলে লটারীতে টাকা পাবার উপায় নাই; ভোটে না দাঁড়ালে এম-এল-এ হবার উপায় নাই! আর এম-এল-এ না হতে পারলে? সেকথা বলে কাজ কি!"[১৪] কী অসাধারণ বাচন ভঙ্গি! মাত্র দুটো-তিনতে কাটা-কাটা বাক্যের ব্যবহারেই পাঠক বুঝতে পারে এম-এল-এ চরণদাস তার কাজের প্রতি কতটা একনিষ্ঠ! এখানেই শেষ নয়, আরও স্পষ্ট ভাবে সতীনাথ পাঠককে জানিয়ে দেন এই চরণদাসজী তার পার্টি, ভোট-কেন্দ্র, ভোটার-ভোটারীদের প্রতি আদৌ কতটা দায়বদ্ধ — "হাই কমাণ্ড নামের এক খামখেয়ালী, সর্বপ্রতাপশালী ভগবানকে তিনি ভয় করেন। সেই হাই কমাণ্ড নাকি বলেছেন যে আসল ভগবান হচ্ছে ভোটার। নারায়ণের চেয়েও বড়, নর-নারায়ণ। ভোটারদের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক কম তাঁকে নাকি আসছেবার এম-এল-এ করা হবে না।"[১৫] কেন্দ্রের এই কড়া নির্দেশে এম-এল-এ চরণদাস নিজের পিঠ বাঁচাতে অর্থাৎ সরকারী অর্থে নিজের বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকে বজায় রাখতে নরনারায়ণের সেবার জন্য দীর্ঘ চার বছর বাদে

পুনরায় ভোট কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হন। চরণ দাসের এই স্বার্থপর সুবিধাবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটে লেখকের এই কথায় — "চরণদাস ঠিক করে রেখেছেন যে এখানে কারোর কথায় বিরক্তি প্রকাশ করবেন না।"[১৬] কারণ এবারে তিনি এসেছেন নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে। তাই এখানে যে অযথা বড় বড় বোলচাল, বক্তৃতা চলবে না তা চরণদাসের ভাল করেই জানা।

চরণদাস চরিত্রটির এই আত্মস্বার্থপরতা, নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়েছেন সতীনাথ এই গল্পেরই আরেকটি চরিত্র লখণলালজীর উক্তির মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ চার বছর বাদে চরণদাসজী যখন তাঁর ভোট কেন্দ্রে এসে বলেন — 'এই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে।' তখন তার কথার উত্তরে লখণলালজী ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলে ওঠে — "তা বেশ করেছেন। আশাই তো উচিত। 'হায়-কমাণ্ড' হুড়ো দিয়েছে বুঝি।"[১৭] আবার চরণদাসজী যখন তাঁর ঝোলা নামিয়ে দাঁত মাজার জন্য দাঁতনের খোঁজ করেন তখনও তাঁর এই মেকী মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে লখণলাল বলে — "হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁতনের দরকার বৈকি। উনি দাঁত মাজবার বুরুশ আনলেও এখানে ব্যাবহার করবেন না। এ যাত্রায় উনি একেবারে পুরনো চরণদাসজী সেজেছেন। নিছক ভোটার-চরণদাসজী।"[১৮] উদ্ধৃত অংশটিতে 'সেজেছেন' শব্দটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এই ছোট্ট একটি শব্দের মধ্য দিয়ে সতীনাথ প্রকাশ করেছেন চরণদাসের মিথ্যে জনগণের চোখে পট্টি পরানোর চেষ্টাকে। অর্থাৎ চরণদাস তাঁর চতুর বুদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ জনগণের চোখে নিজেকে তাদের জন্য 'নিবেদিত প্রাণ' প্রমাণ করবার যে চেষ্টা করেছিল তা যে সকলের চোখে ধরা পড়েছে সেটাই সতীনাথ 'সেজেছেন' শব্দটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

রাজনৈতিক নেতারা যে নিজেদের প্রয়োজনে গিরগিটির মত যখন তখন রং বদলাতে অভ্যস্ত তারও প্রমাণ মেলে চরণদাস চরিত্রটির নানা কার্যকলাপে। সতীনাথ এখানে দেখিয়েছেন একজন এম-এল-এ নিজের পদমর্যাদা কিংবা আত্মসম্মানের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে শুধু মাত্র নিজের চেয়ারটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কতখানি নীচে নামতে পারেন — তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন চরণদাসজী তার সকল ভোটার ভোটারীদের খুশি করতে মৌলবী সাহেবের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাত জোড় করে তাকে অনুরোধ করেন 'গুরু শ্রী সহস্রানন্দ স্বামীজী'- কে যেন জনগণনার মধ্যে আনা না হয়। কারণ জনতার বিশ্বাস তিনি স্বয়ং ভগবান। চরণদাসের এই কর্মকাণ্ডকে সতীনাথ যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার সামান্য উদ্ধৃতিতেই বিষয়টি পাঠকের কাছে যেমন স্পষ্ট হবে তেমনি একই সঙ্গে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয়টিও পরিস্ফুট হবে — "বিকেলের দিকে এম-এল-এ সাহেব, লখণলাল, আর বচ্‌কন্ মহতো ফলমূল, পেঁড়া, সন্দেশের ভেট নিয়ে খালি গায়ে খালি পায়ে গিয়ে হাজির জগদ্‌গুরু শ্রী সহস্রানন্দের আশ্রমে।"[১৯] আশ্রমে গিয়ে তিনি গুরুজীর সকল ভক্তদের কাছ থেকে জানতে পারলেন সেই অনাসৃষ্টির কথা। সেখানে গুরুদেবকেও সেন্সাসের জন্য আসা মৌলবী সাহেব জনগণনার মধ্যে হিসেব করেছেন। আর তাতেই সহস্রানন্দ গুরুজীর সব ভক্তবৃন্দরা ক্ষেপে উঠেছে।

এমতাবস্থায় চরণদাস 'পবন অনুকূল' দেখে তাঁর ভোটার ভোটারীদের কথা দেন "চেষ্টার ত্রুটি আমি রাখবো না। এর জন্য দিল্লি পর্যন্ত যেতে হয় তো যাবো।"[২০] একদিকে জনতাকে আশ্বাস দেন যে জনগণনা থেকে গুরুজীর নাম যেমন করেই হোক তিনি কাটিয়ে দেবেন। আর অন্যদিকে মনে মনে ঠিক করেন "গুড় দিয়েই যদি মাছি মরে তবে আর তিতো ওষুধ ব্যবহার করার দরকার কি!"[২১] এরপরই চরণদাসজী তার সকল ভোটার ভোটারীদের নিয়ে রওনা হন মৌলবী সাহেবের বাড়ির দিকে। মৌলবীর সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি এসে লখনলাল বলে — "এখান থেকে ইয়েমিয়েলিয়ে - সাহাব একাই যাবেন সে বদ মৌলবীটার বাড়িতে। ... মায়লেজীর উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় সেজন্য আসুন আমরা সকলে মিলে ততক্ষণ এই গাছতলায় বসে গুরুদেবের নাম জপ করি।"[২২] এরপর জনতাকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে চরণদাসজী প্রবেশ করেন মৌলবী সাহেবের বাড়িতে। চরণদাসের পা কাঁপছে মনের বলও তেমন পাচ্ছেন না। কারণ তিনি জানেন এ বড় কঠিন ঠাঁই। তাই নিজের কাজকে যেকোন উপায়ে হাসিল করতে বদ্ধপরিকর চরণদাসজী 'গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন' মৌলবী সাহেবের পায়ের উপর। "বেশ করে জড়িয়ে ধরেছেন পাজামা সম্বলিত পা দুখানা। ... তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না — যতক্ষণ না মৌলবী সাহেব তাকে কথা দিচ্ছেন যে তার একটা অনুরোধ রাখবেন।"[২৩] এই ভাবে মৌলবী সাহেবের হাতে পায়ে ধরে চরণদাসজী গুরু শ্রী সহস্রানন্দ স্বামীজীর নাম জনগণনার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিজের এম. এল. এ. হবার রাস্তাটা পরিস্কার করে নেন।

সতীনাথ চরিত্র অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার করে যে ভাবে চরিত্রের গতি-বিধি মনপ্রকৃতি, কার্যকলাপ প্রভৃতিকে তুলে ধরেছেন তা যেমন অনবদ্য তেমনি আকর্ষণীয়ও বটে।

রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীদের চরম অজ্ঞানতা অপদার্থতার পরিচয় পাই আমরা সতীনাথের আরেকটি গল্প 'পরকীয় সন-ইন-ল' (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) গল্পটিতেও। কেবল যে ক্ষমতার জোরেই নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তি মন্ত্রী বা আমলা হয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ মেলে — "ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া ছিল; পবন অনুকূল ছিল; কাজেই শ্রী সাহেবরাম এম. এল. এ.-কে Co-ordination বিভাগের উপমন্ত্রি হবার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হল না।"[২৪] এই উক্তিটির মধ্য দিয়েই। তবে এটুকুতেই শেষ নয়। এই সকল অযোগ্য লোকের হাতে দেশ বা রাজ্য চালনার ভার অর্পিত হলে কত বড়ো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তাদের অজ্ঞতার কারণে তারও পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। সতীনাথ এই গল্পটিতে মন্ত্রী সাহেবরামজীর কর্ম দক্ষতার নানাবিধ প্রমাণ উল্লেখ করে তিনি যে কত বড়ো যোগ্য মন্ত্রী ছিলেন? তার বিচারের ভার বোধহয় পাঠকের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের দিনই দেখা যায় দলের তত্ত্ববিদ যখন তাকে বলেন "পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার সাফল্যে পথের দুইটি বাঁধার উপর শুধু আপনার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রথম হচ্ছে bottleneck; আর দ্বিতীয় হচ্ছে Parkinson's Law... "[২৫] তখন সাহেবরাম তাঁর নিজের পুথিগত বিদ্যার দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের দৌলতে 'Parkinson's

Law' -এর অর্থ করেছিলেন 'পরের (পরকী) সন-ইন-ল অর্থাৎ পরের জামাই' এবং নিজের বোঝা অর্থ অনুযায়ী তিনি তৎক্ষনাৎ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন — "পরের (পরকী) সন-ইন-ল কেন, নিজের জামাইকেও আমি চাকরী দেব না।"[২৬] আর bottleneck -এর অর্থও নিজের মত করে বলেছিলেন — "অফিসারদের কর্ম তৎপরতা বজায় রাখতে গেলে দরকার রুচিকর খাদ্যের। অখাদ্য কুখাদ্যের bottleneck দূর করবার জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে Parkinson's Law অনুযায়ী দুই জন সরকারী বাবুর্চি বহাল করা হোক, অফিসারদের ক্লাবে।"[২৭]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকেই সহজেই পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন সাহেবরামজীর যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও পারদর্শিতা কতদূর ছিল। সামান্য বিষয়কে অবলম্বন করে সরল রৈখিক প্লটের মাধ্যমে সতীনাথ এই গল্পে দেখিয়েছেন রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীদের অযোগ্যতা, অক্ষমতায় কীভাবে দেশ ও দশের ক্ষতি হয়ে যায়।

রাজনীতির জগৎ কোন নির্দিষ্ট বা মুষ্টিমেয় মানুষের নয়। রাজনীতিতে সর্বদাই বহু মানুষের সমাগম ঘটে। তাদের মধ্যে কিছু লোক আসে সত্যিকারের রাজনীতির প্রতি ভালোবাসা নিয়ে, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে; আর কিছুলোক আসে নিছক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা চাহিদাগুলিকে পূরণ করতে। আর এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের নিয়েই সতীনাথের লেখা আরেকটি গল্প 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' (১৩৭১ বঙ্গাব্দ)। বাভ্নগামার ছোট-বড়-মাঝারি ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী কিংবা অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু মানুষ যাদেরকে প্রতি বছর তাদের উপার্জনের একটা নির্দিষ্ট অংশ সরকারের ঘরে জমা করাতে হয় কর বাবদ। তারা দীর্ঘ দিন ধরেই এ নিয়ে ভীষণ বিরক্ত। বাভ্নগামার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে গদিয়ান পার্টির সমস্ত নেতাদের কাছে তারা এবিষয়ে বারবার তদ্‌বির করেও কিছু করাতে পারেননি। তাই তিতি বিরক্ত হয়ে এই সকল মানুষেরা নিজেদের স্বার্থে তৈরী করেছেন একটি নতুন রাজনৈতিক দল — 'আর. পি. এ' বা 'করদাতা সংঘ'।

সতীনাথের অধিকাংশ গল্পের মতই এ গল্প বিবৃত হয়েছে একজন কথকের মুখ দিয়ে। তবে কথক এখানে গল্পের কোন চরিত্র নয়। শুধুই গল্পকথক মাত্র — নিরপেক্ষ ভাবে ঘটনা ধারার বর্ণনা করে গেছেন। প্লটের দিক থেকে বিচার করলে 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' গল্পটি সরল বা এক রৈখিক প্লটে রচিত। কারণ গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করদাতা সংঘের উৎপত্তির কারণ, তাদের কার্যাবলী, এবং কর্মপরিকল্পনার কথাই বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পে তাই প্লট মুখ্য নয়। এখানে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লেখক সহজ সরল ভাবে কাহিনীকে বর্ণনা করে গেছেন। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ কীভাবে রাজনীতিকে ব্যবহার করে নিজেদের অসৎ ভাবনা ও কাজ কর্মকে হাসিল করে নিতে চায় তারই চিত্র এঁকেছেন এই গল্পটির মধ্য দিয়ে।

গল্পের শুরুতেই লেখক পাঠককে জানিয়ে দেন করদাতা সংঘের হঠাৎ গজিয়ে ওঠার কথা — ''আগয়া'। এসে গেল; এসে গেল আবার।... ভোট ভোট। মিউনিসিপ্যালিটির ভোট।... কাজেই প্রতিবারের মত এবারও জন্ম নিতে হল 'রেট্ পেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন'- কে। 'আর. পি. এ'। মরসুমী ফুল এবার রঙ বদলেছে; হিন্দিতে নাম করণ হয়েছে 'করদাতা সংঘ'।''[২৮]

উদ্ধৃত অংশটুকু থেকে বুদ্ধিমান পাঠক বুঝে নিতে পারেন গল্পের কাহিনী কোন দিকে এগোচ্ছে। বিশেষ করে 'মরসুমী ফুল' কথাটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সামান্য একটা শব্দের ব্যবহারই লেখকের অনেক না বলা কথাকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। মরসুমী ফুল অর্থাৎ Seasenal Flower - যা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফোটে, এবং সেই সময়টুকু অতিবাহিত হলে ঝরে যায়, এমনকি গাছটিও মরে যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় ভোট সামনে এলেই হঠাৎ হঠাৎ কিছু নতুন দল গজিয়ে ওঠে নিজেদের বিশেষ কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্য। তারপর হয়ত ভোট পর্ব শেষ হতেই সে পার্টিগুলির সলিল সমাধি হয়। আর এ গল্পেও মিউনিসিপ্যালিটির ভোটকে কেন্দ্র করে নতুন করে তৈরী হওয়া পার্টি করদাতা সংঘ সম্পর্কে লেখকের এই শ্লেষ-মিশ্রিত বিশেষণটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এরপর কাহিনী যতই এগিয়েছে ততই স্পষ্ট হয়েছে করদাতা সংঘের অন্তঃসারশূন্য-বালখিল্য-হাস্যকর-উদ্ভট কিছু পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী গ্রহণের বিষয়টি। সেই সঙ্গে এ পার্টির সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির নীতিহীনতা, দৃঢ়তাহীন ব্যক্তিত্বের প্রকাশও ঘটেছে।

বলা বাহুল্য, 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' অবশ্যই একটি স্যাটায়ার ধর্মী গল্প। এই গল্পে লেখক তাঁর সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ মেধা দিয়ে সেই সকল মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গ বাণ নিক্ষেপ করেছেন যারা রাজনীতির ক্ষেত্রটিকে খুব ছোট করে দেখে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় রাজনীতিকে ব্যবহার করেছেন। তারা কখনো বুঝতে চেষ্টা করেননি রাজনীতি কোন সামান্য বিষয় নয়। এর ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত। করদাতা সংঘের সদস্যরাও রাজনীতিকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তারা নিজেদের দলের জন্য দলপতি নির্বাচনে যোগ্যতার যে মাপকাঠি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে দেখা যায়, যে ব্যক্তি সারা জীবনে সবচেয়ে বেশি কর ফাঁকি দিয়েছেন তিনি করদাতা সংঘের দলপতি হবার যোগ্য। এই শ্রেণীর মানুষের মনোভাব ও চরিত্রকে স্পষ্ট করতে সতীনাথ গল্পে একটি চরিত্র দারোগা মাহতোর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন — ''দারোগা মহতো বললেন 'আমি দলপতি পদের জন্য বাঙালির মহতোর নাম প্রস্তব করছি। এঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। এত বড় এঁর মোটর গাড়ি মেরামতের কারখানা, এত বড় এঁর মোটর পার্টস্ এর দোকান; কিন্তু গত এগারো বছরের মধ্যে এক পয়সাও সেলস্ ট্যাক্স দেননি গভর্ণমেন্টকে। গভর্ণমেন্ট চেষ্টার ত্রুটি করেনি; কিন্তু পেরে ওঠেনি এর সঙ্গে কূটবুদ্ধিতে।''[২৯]

নিজের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধান্ত বা কার্যাবলী থেকে স্বার্থান্বেষী ভুঁইফোড় রাজনৈতিক নেতারা রাজনীতির রং লাগিয়ে নিজেকে হাস্যকর করে তুলতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না বা লজ্জিত হন না তার প্রমাণ মেলে এই গল্পের রামখড়মসিং নামক চরিত্রটি যখন তার বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করার বিষয়টিকে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে পারেন। রামখড়মসিং গদিয়ান পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে করদাতা সংঘে এসে যোগদান করেন এবং করদাতা সংঘের দলপতি হবার ইচ্ছে পোষণ করে নিজেকে সবচেয়ে যোগ্য প্রমাণ করতে বলেন — ''আপনাদের যাচাই করবার সুবিধার জন্য এইবার নিজের যোগ্যতার কথাটা বলি। ... দেয় কর আইন বাঁচিয়ে এড়িয়ে যাবার নৈপুণ্যকেই সর্বোচ্চ যোগ্যতা বলে ধরা হবে দলপতি পদের জন্য; আর কে নিজের জীবনে সেই নিপুণতাকেই কিরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তার ওপরও সম্যক গুরুত্ব দেওয়া হবে। ... আমার বিবাহের কথাটা বলছি। কেন বিবাহ করলাম সেই কথাটা কেউ জানে না। ... এতকাল বিয়ে না করে যদি আমার চলেছে, তাহলে জীবনের বাকি দিন কয়টাও অবিবাহিত জীবন যাপন করে পারতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু তা যে হবার নয়। আপনাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমায় বাধ্য করেছে আমার জীবনের ধারা বদলাতে। ... আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বিবাহিত লোকের তুলনায় অবিবাহিত লোকেদের ওপর কিরূপ অবিচার করে ইনকাম ট্যাক্স আইন। আয়কর এড়াবার জন্যই আমি এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বিয়ে করেছি। ...''[৩০] রামখড়মসিং-এর এই বক্তব্যই তাঁর চরিত্রকে স্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। সতীনাথ তাঁর বিষয় ও ভাবনাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে আলাদা করে কোন বিবৃতি দেননি। চরিত্রগুলোর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়েই তাঁর বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

করদাতা সংঘের সদস্যরা গল্পের শুরুতে তৎকালীন গদিয়ান পার্টির বহিষ্কৃত লিডার রামখড়মসিংকে উদ্দেশ্য করে স্লোগান দেয় — ''রামখড়মসিং মুর্দাবাদ। করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ।''[৩১] আবার গল্পের শেষে যখন রামখরমসিং-এর বিবাহ করার কারণ শুনে সন্তুষ্ট হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে নিজেদের দলপতি বলে ঘোষণা করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যে পুনরায় সেই একই সদস্যরা স্লোগান দেয় — 'রামখড়মসিং কা জয়। পার্টি লিডার কা জয়।''[৩২] সুতরাং এই বিপরীতধর্মী দুটি বাক্যের ব্যবহার দেখেই পাঠক বুঝে নিতে পারে করদাতা সংঘের সদস্যদের মৌলিক চরিত্রকে। আর এভাবেই সতীনাথ সামান্য ইঙ্গিত সূচক শব্দ বা বাক্যের ব্যবহারে অনেক না বলা কথাকে স্পষ্ট করতে পেরেছেন। আর এখানেই বোধহয় তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

এ গল্পেও তাঁর ভাষা ব্যবহার চরিত্রানুগ হয়েছে এবং স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী শব্দ বা ভাষার ব্যবহারেও পার্থক্য ঘটেছে। যেমন গল্পের স্থান যেহেতু বিহার অধ্যুষিত এলাকা তাই গল্পের শুরুতেই রয়েছে সেই এলাকার স্থানীয় ভাষার আভাস — 'আ গয়া' কিংবা 'সজ্জনো' কিংবা 'সাথিয়োঁ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার। 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' গল্পে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। সতীনাথের

ছোটগল্পগুলি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায় যে তিনি গল্পের প্রয়োজনে কিংবা চরিত্রের সংলাপের প্রয়োজনে কিংবা বিষয়কে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে কখনো কখনো বেশ কিছু শব্দ নিজের মত করে তৈরী করে নিয়েছেন। যেমন এই গল্পে 'গদিয়ান পার্টি' এই শব্দটি বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে নতুন শব্দ। 'গদিয়ান পার্টি' শব্দটির অর্থ ক্ষমতাশীল পার্টি। কিন্তু লেখক শব্দটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্যই এই নতুন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শব্দটিতে শ্লেষ মিশে রয়েছে।

উপরে আলোচিত রাজনীতিমূলক গল্পগুলির বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে সতীনাথের আরেকটি রাজনীতিমূলক গল্প 'আন্তর্জাতিক' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)। এই গল্পটিতে সতীনাথ দেখিয়েছেন রাজনীতির জগতে অসৎ-ভণ্ড-স্বার্থ কায়েমী-মূর্খ লোকেদের ভিড় বেশি হলেও সৎ-প্রত্যয়ী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সংখ্যাও একেবারে অনুপস্থিত নয়। এমন কিছু লোক বা এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা রাজনীতিতে নিজেদের মন প্রাণ সঁপে দিয়ে নিজের ঘর-বাড়ি-আত্মীয়-পরিজন সব কিছু ছেড়ে আজীবন রাজনীতির জন্য রাষ্ট্রের জন্য, জনসাধারণের জন্য একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে গেছেন।

'আন্তর্জাতিক' গল্পটির পটভূমি নেপাল ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা — গল্পে যার নাম 'দশগজ্জা'। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সূর্যসমশের নেপালের তৃতীয় রাণা পরিবারের সদস্য। গল্পটির সময়কাল নেপাল কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সমকাল। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে কথকের দ্বারা, কথকই এখানে মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কথকের বর্ণনার মধ্য দিয়েই পাঠক চিনে নেয় সূর্যসমশের রাণাকে। পাঠক জানতে পারে তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে। এমনকি তার বিরাট আত্মত্যাগের কথাও অবহিত হয় কথকের বর্ণনার মধ্য দিয়েই। গল্পটির কাহিনীতে বিশেষ কোন চমক নেই। সরলরৈখিক প্লটের মধ্য দিয়ে লেখক একজন নেপালী দেশভক্ত যুবকের দেশপ্রেম ও আত্মদানের কথাকেই এখানে তুলে ধরেছেন। গল্পের শুরু হয় সূর্যসমশেরের সামান্য ব্যক্তিগত জীবনের কথা দিয়ে, তারপর রাজনীতির জগতে যোগদান ও একনিষ্ঠ কর্মের বর্ণনা এবং গল্পের শেষ হয় তার মর্মান্তিক মৃত্যু বা প্রাণ দানের মধ্য দিয়ে। সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ গল্পটি জুড়ে রয়েছে অনেক ছোট-বড় মহিলাকর্মী সমর্থকদের কথা, যারা প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতির জগতে না এসেও পরোক্ষভাবে দেশ উদ্ধারে বা দেশের স্বাধীনতার জন্য সমর্থন করে গেছে ও নিজেদের সাধ্যমত সাহায্য করেছে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাইদের।

সতীনাথ ছিলেন বহুভাষা জ্ঞানী। তিনি দেশী-বিদেশী অনেক ভাষাতেই ছিলেন বেশ সাবলীল। আর তারই প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্পে। 'আন্তর্জাতিক' গল্পটি যেহেতু নেপাল ভারতের সীমান্তবর্তী পটভূমিতে লেখা তাই এই গল্পের কাহিনী সংলাপে যথাযথ বাস্তবতা বজায় রাখতে তিনি চরিত্রদের মুখে বেশ কিছু প্রাদেশিক শব্দের, নেপালী ভাষার সংলাপের ব্যবহার করেছেন। যেমন সূর্যসমশের রাণার কথায় — "আইন পড়তে আসবার আগে সরকারের অনুমতি নিয়ে

আসতে হয়েছিল। কাঠমাণ্ডু কলেজে নাম করা বাঙালী প্রফেসারের সঙ্গে তিন সরকারের হুজুরিয়ার খুব অন্তরঙ্গতা।"[৩৩] এখানে 'তিন সরকার' ও 'হুজুরিয়া' শব্দ দুটির ব্যবহার লক্ষণীয়। 'তিন সরকার' অর্থে বোঝান হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। আর 'হুজুরিয়া' শব্দটির দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বোঝান হয়েছে। এছাড়াও চাকরি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'জাগীর' শব্দটি। নেপালের ভীমভার মিলে মহিলা শ্রমিকদের ওপরে গুলি চালানোর প্রসঙ্গে লেখক বেশ কিছু নেপালী সংলাপ রচনা করেছেন —

> "নাগরিক হককো মাঙ্গ গর।
> ভীমভার মাঁ গোলী চল্যো। তিনজনা দিদিবাহিনী গোলিকা শিকার ভয়ে ...
> ... হামরা নিশস্ত্র দাজুভাই দিদিবাহিনী সানা সানা বালক বালিকা হরু মাথী
> সঙ্গীন প্রহার মেশিনগান লে বরাবর গোলী-বর্ষাই রাখে কা ছন।
> ... তসর্থ সাহায়তাকো লাগি নিবেদন ছ, যথাশক্তি তথাভক্তি, সামর্থ
> অনুসার সহায়তা দান গর্ণুহোলা ...।"[৩৪]

এই সংলাপের ব্যবহারে গল্পটির কাহিনী আরও বেশী বাস্তবসম্মত এবং যথোপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

গল্পের শুরু করেছেন 'জয় পশুপতি নাথ!' এই বাক্য খণ্ডের মধ্য দিয়ে। যা থেকে অনুমান করে নিতে পারে গল্পের স্থান বা পটভূমি সম্পর্কে। পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চরিত্রকে যথার্থ সার্থক করে তুলতে সতীনাথ গল্পটির অনেক জায়গাতেই এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। আবার কখন কখন এ ধরনের আরও কিছু বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন — উপাধ্যায়জীর মুখ থেকে ভীমভারমিলে মহিলা শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানোর মর্মান্তিক ঘটনা শুনে এবং আসল সত্যকে চাপা দিতে সরকারের মিথ্যে রটনার কথা শুনে সূর্যসমশের বলে ওঠে — "জয় পশুপতি নাথ! ক্ষাত্র রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে এই অন্যায়ে, এই মিথ্যাচারে, জরাগ্রস্ত অন্ধ ত্রিনেত্রের উপর ভক্তি শিথিল হয়ে আসে বুঝি।"[৩৫]

একজন মানুষের জীবনের গল্প নিয়েও যে শিল্প নির্মাণ করা যায়, সেটাও যে অনায়াসেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন হতে পারে সতীনাথের 'আন্তর্জাতিক' গল্পটি তারই অনবদ্য উদাহরণ।

এবার সতীনাথ ভাদুড়ীর সমাজ ও সমাজ সমস্যামূলক গল্পগুলির ভাষা-চরিত্র-কাহিনী-উপস্থাপন রীতি প্রভৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্-নির্মিতিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো। সতীনাথের সামাজিক গল্পের শ্রেণীতে যে নামটি প্রথমেই মনে পড়ে তা হল 'বন্যা' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)। 'বন্যা' সতীনাথের 'গণনায়ক' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প। 'বন্যা' গল্পটি সতীনাথ শুরু করেছেন বর্ণনামূলক কাহিনী কথনের মধ্য দিয়ে। 'বন্যা' গল্পের মূল পটভূমি বিহারের বিখ্যাত কুশী নদীর তীরের একটি প্রান্তিক গ্রাম রহিকপুরা। বন্যা, বন্যার ফলশ্রুতিতে একদিকে রহিকপুরা গ্রামের

মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা, অন্য দিকে গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে চিরকালীন জাত-পাতের ভেদাভেদ। এই দুটি ঘটনাকে নিয়েই লেখক এই গল্পের প্লট নির্মাণ করেছেন।

(১) কুশী নদীতে বান ডাকার ফলে রহিকপুরা গ্রামে যে ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে লেখক তাঁর কোন পারদর্শিতা নিয়ে একেবারে চলচ্চিত্রের ছবির মত সেই বন্যা পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন; কীভাবে একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বীভৎসতার সর্বগ্রাসিতাকে তৈলচিত্র শিল্পের মত করে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(২) মিশ্র সংস্কৃতি সম্পন্ন গ্রাম রহিকপুরাতে বসবাসকারী মানুষগুলোর মধ্যে জাত-পাতের দ্বন্দ্বের শেকড় কতটা গভীর পর্যন্ত প্রোথিত হয়েছে; তার ভয়াবহ রূপ এবং পরিণতিকে লেখক কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক লেখক কীভাবে বন্যা পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন। 'বন্যা' গল্পে লক্ষণীয় বিষয় গল্পকারের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি। গল্পের মূল বিষয় 'বন্যা' যা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কারণ 'বন্যা' মানুষের সাজানো-গোছানো জীবনকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মানুষের অস্তিত্বের সংকট দেখা যেতে পারে বন্যার ফলে। সতীনাথ যে নিরাসক্ত ও ভাবাবেগ মুক্ত হয়ে নির্লিপ্ত ভাষায় বন্যার সর্বগ্রাসী রূপের বর্ণনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে পাঠককে আবেগতাড়িত করে তোলে। হিমালয়ের কোন অরণ্যময় উপত্যকায় অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতি কীভাবে রহিকপুরা বাসীর প্রায় নিস্তরঙ্গ জীবনে আকস্মিক বিপদ নিয়ে উপস্থিত হয় তার বর্ণনায় সতীনাথ লিখেছেন — "কুশী নদীতে বান আসিয়াছে; একরকম নোটিস না দিয়াই ... রহিকপুরা গ্রামের নিয়ম অনুসারে মেয়েরা সকলেই শেষ রাত্রেই ওঠে। তাহারা কেহই আঙিনার বাহিরে যাইতে পারে নাই; কেহ কেহ আঙিনাতেও নামিতে পারে নাই।

তাহাদের চিৎকারে পুরুষেরা জাগে। কেহ লাঠি লইয়া ওঠে, কেহ বর্শা লইয়া আসে। ... চোখের জড়তা ভাঙিবার পূর্বেই চন্দ্র গ্রহণের মত ঢাক, ঢোল, শাঁক, ঘন্টা বাজিয়া ওঠে। ... মেয়েরা আঙিনায় বলে 'ওমা, জল যে বারান্দায় উঠে আসছে।' চোখের ওপর দেখিতেছে এই দাওয়ায় উঠিবার দ্বিতীয় সিঁড়ি ডুবিল। এরও এক আঙুল বাড়িয়াছে।"[৩৬] লেখকের এই বর্ণনায় যতটা নির্লিপ্ত ভাব রয়েছে, পাঠক তাঁর মত নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। হঠাৎ উপস্থিত হওয়া বন্যাতে দিশেহারা রহিকপুরার মানুষগুলো যে যেভাবে পারে চেষ্টা করে চলে নিজের সহায়-সম্বলটুকু বাঁচাতে। দিশেহারা পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাড়ির মহিলা-পুরুষেরা কীভাবে বিপর্যয়ের মধ্যেও প্রাণান্ত চেষ্টা করে চলে নিজেদের সংসারের জিনিস-পত্র বাঁচাতে সেই বর্ণনার বাক্‌ভঙ্গি বা সংলাপ নির্মাণের কৌশলটি সত্যি পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না। বন্যার জল যত দ্রুত বাড়তে থাকে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ির মেয়ে-পুরুষেরা বলতে থাকে — "মজা দেখছিস কি! ঘুঁটে কখানা তোল্। কাঠগুলো উপরে ওঠা। ভুসির

জালাগুলো কি করিয়া সরানো যায়। কাঁচা মাটির বিরাট বিরাট জালা। জল লাগিলেই গলিয়া যাইবে।"[৩৭] এই ভাবেই প্রায় ছবি আঁকার মত করে লেখক ক্রমশঃ বাড়তে থাকা বন্যা পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন। বন্যার মত একটা ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা এক মুহূর্তে মানুষের জীবনকে তছনছ করে দেয় — সেই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গিয়েও লেখক কোন আলাদা বিশেষণ, কোন বিশেষ অলংকার কিংবা কোন বিশেষ উপমার ব্যবহার করেননি। নিতান্ত সহজ সাদামাটা ভাষায় কাটা কাটা বাক্যে যেভাবে তিনি চরিত্রের পারস্পরিক উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে পুরো বিষয়টিকে পরিস্ফুট করেছেন তাতে পাঠক মাত্রই তাঁর পারদর্শিতায় মুগ্ধ হবে।

কুশী নদীতে যখন হঠাৎ বান এসেছে — যখন রহিকপুরা গ্রামের মানুষগুলোর জীবন বিপদের সম্মুখীন, তখন সতীনাথ বন্যার ভয়াল মূর্তির বর্ণনায় লিখছেন — "চালার চর্তুদিকে সর্পিল ঢেউয়ের রাশি আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; ফণা তুলিয়া সহস্রমুখ বাসুকি শত্রুর ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একরাশ সাদা আলোকময় বারিকণা চালাটিকে ভিজাইয়া দিল। পিছনে একটি শব দেহ আসিতেছে তীব্র গতিতে। একটি কাক চোখ-মুখের উপর ঠুকরাইতেছে।"[৩৮] এই বর্ণনায় পাঠক যেন শিউরে ওঠে। বর্ণনার এই নির্লিপ্ত ভঙ্গি সতীনাথের সহজাত। বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গল্প লিখলেও সতীনাথ কখনও নিজের নিরাসক্ত-নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিকে বিসর্জন দেন নি। বন্যার ভয়ঙ্করী রূপের বর্ণনায়ও লেখক তাই সমতুল শীতল মনোভাবাপন্ন। কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করেও কীভাবে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে, নিরপেক্ষতা-নির্লিপ্ততা ধরে রেখে কাহিনীকে উপস্থাপন করতে হয় সেই কৌশল জানা ছিল সতীনাথের। তাই কোথাও এতটুকু আন্তরিকতাকে নষ্ট হতে না দিয়েও নিরপেক্ষ ভাবে, নিরাসক্ত ভাবে সতীনাথ বর্ণনা করেছেন রহিকপুরার ভিন্ন ভিন্ন জাতি সম্প্রদায় মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সংস্কার, সর্বোপরি তাদের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বাস্তব চিত্রকে। তাই বন্যা পরিস্থিতির মতই রহিকপুরা গ্রামের শ্রেণী সংঘাতকে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সহজ-সরল-স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গিতে। গল্পের শুরুর দিকেই রহিকপুরা মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। বিহারের বিভিন্ন জনসমাজে মানুষের নানা বিন্যাস ও বিচিত্র জীবন চর্যাকে খুঁটিয়ে দেখা লেখকের সাহিত্যে যে কীভাবে কতটা প্রভাব ফেলেছে 'বন্যা' গল্পটির মধ্যে তার একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, তিয়র, ধাঙড়, মুসহর, বাঁতার প্রভৃতি জনজাতির মানুষের বসবাস রহিকপুরা গ্রামে। এদের প্রত্যেকের চালচলন, মুখের ভাষা তথা জতিগত বৈশিষ্ট্য সহ একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র সতীনাথ তুলে ধরেছেন এই গল্পটিতে। যেমন, সাঁওতালদের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন — "দুলহা মাঝির ছেলে সাঁওতাল টোলায় একখানা কড়া বাজাইতেছে — ডুম্ ডুম্ ডুম্। মহরমের ঢোলের মত ফৌজি তাল।"[৩৯] মুসহর প্রজাতির মানুষদের বর্ণনায় লিখেছেন — "মুসহরটোলা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে নীচু জায়গায়। মুসহরটোলার কুটিরগুলি প্রায় ডুবিল। তাহারা অন্য পাড়ায় এক-এক করিয়া আসিয়া জোটে। ... তাহাদের জিনিস পত্রের মধ্যে তো হাঁড়িকুঁড়ি, উখলি

সামাট্। কোন স্থানেই বা তাহারা একনাগাড়ে বেশি দিন থাকে? কোন রকমে মাথা গুঁজিবার স্থান সে দিনটার মত হইলেই হৈল। কথায় বলে 'এক কাঠা ভুট্টার দানায় মুসহর রাজা।' "[৪০] তুরিয়া, বাঁতার সম্প্রদায়ের মানুষের কথা বলতে গিয়ে নৌখে ঝার মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন — ''কোন কাজের শৃঙ্খলা যদি থাকে এই পাড়ার লোকেদের! তুরিয়া, বাঁতার এই সময়ও মোটা সুতায় বাঁধা বঁড়শির সহিত প্রকাণ্ড একটা ছাল ছাড়ানো সোনা ব্যাঙ গাঁথিতেছে। নৌখে ঝা জিজ্ঞেস করে, 'কিরে তোরা জিনিস পত্র সামলেছিস?' আমার পূতহু আছে সেয়ানা। সে আর বেশি কথা খরচ না করে সুতাটিকে একটি বাখারির সহিত বাঁধিতে থাকে।"[৪১]

আর গ্রামের সবচেয়ে অবস্থা সম্পন্ন দুটি পরিবার হল — সুমৃৎ তিয়র — যে তিয়র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে, আর নৌখে ঝা — যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। সতীনাথ এখানে যতখানি সম্ভব বাস্তবতা বজায় রেখেই প্রত্যেকটি জাতের বৈশিষ্ট্যকে আলাদা আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তেমনি পাঠককে এটাও জানাতে ভোলেন নি যে তবে এদের সকলের মধ্যে যে মিল-মহব্বৎ আছে তা একেবারেই নয়। ''কোনো বিশাল-নৈসর্গিক বিপদের সময় ছাড়া রহিকপুরা গ্রামের সকলে একমত কখনও হয় নাই।"[৪২] ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে উচ্চশ্রেণীর বলে সকলের থেকে পৃথক মনোভাব পোষণ করে। আবার তিয়রেরাও নিজেদেরকে কোন অংশে কম মনে করে না। এছাড়া শীর্ষাবাদিয়ারাও নিজেদেরকে মুর্শিদাবাদের হাবসী খোঁজার বংশধর বলে বেশ বড়াই করে, কেউ তাদেরকে 'বাধিয়া' বললে তারা বলে — '' 'শীর্ষাবাদিয়া' না বলে ফের যদি 'বাধিয়া' বলিস, তা হলে জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব বলে রাখলাম।"[৪৩] তবে অন্যান্য জনজাতি থাকলেও রহিকপুরা গ্রামের মূল লড়াই-রেষারেষি-দ্বন্দ্ব ব্রাহ্মণ আর তিয়র সম্প্রদায়ের মধ্যে। গ্রামের দুই আস্থাবান পরিবার নৌখে ঝা এবং সুমৃত তিয়র — ''এই দুই পরিবারের মধ্যে রেষারেষি, ঝগড়া, ফৌজদারি নিত্য লাগিয়াই আছে। প্রথমে ছিল দুই জনের পিতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত; পরে হইয়া দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ ও তিয়র দুই জাতির মধ্যে কলহ।"[৪৩]

তবে জাত-পাতের দ্বন্দ্ব থাকলেও কোন নৈসর্গিক বিপদের সময় রহিকপুরা গ্রামের সকলে কীভাবে একত্র হয়ে তার মোকাবিলা করে তার বর্ণনা দিতেও লেখক ভোলেননি। কুশী নদীতে বান এলে সকলে আপাত দ্বন্দ্ব-হিংসা-ঈর্ষা ভুলে সংঘবদ্ধ হয়ে বন্যার জলের সঙ্গে যেভাবে মোকাবিলা করে তার চিত্রও পাঠকের কাছে নতুনত্বের আস্বাদ দেয়। যেমন — রিলিফ ক্যাম্পে পৌঁছে ভলান্টিয়ররা যখন উনুন করবার জন্য ইঁট আনতে স্লিপ লিখে দেয় তখন নৌখে ঝাঁর স্ত্রী সুমৃৎ তিয়রের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে — ''কে যাবে ভাই ইঁট আনতে?" সঙ্গে সঙ্গে মুসহরনী বলে, 'আমরা আনবো'। সাঁওতালনীরা বলে 'আমরা আনবো'। 'তোমরা কি মা এসব কাজ করতে পার, না কোন দিন করেছ। আমাদের গাঁয়ের ইজ্জত খ্যাতি আমাদের হাতে। তোমাদের কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।"[৪৫] এই ভাবেই উঁচু জাতের মহিলাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নীচু জাতের মহিলারা তাদের কাজে সাহায্যের

হাত বাড়িয়ে দেয়। তিয়র গিন্নী ঝা-এর আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে যখন বলে — "ভয় কী! কৌশিকী মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।"[৪৬] তখন তিয়র গিন্নীর কাজে পাঠকও যেন গর্বিত বোধ করে। একজন আসন্ন প্রসবা নারী এবং তার পরিবারের পাশে বিপদের মধ্যেও সকলে কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তার যে বর্ণনা সতীনাথ দিয়েছেন তা যেমন মানবিক তেমনি সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ — "সুমৃত দৌড়িয়া রিলিফ কমিটিতে খবর দিতে যায়। শীর্ষাবাদিয়া মনিরুদ্দি আর তাহার ভাই দলিমুদ্দি ক্যাম্পের কোণায় নিজেদের চাটাইগুলি ঘিরিয়া আবরু করিয়া দেয়। কানী মুসহরনী মালসাতে করিয়া কাঠের আগুন লইয়া আসে। সুমৃতের স্ত্রীর সহিত অনেকেই সেই চাটাই ঘেরা স্থানে সারারাত চেঁচামেচি করে। ঘেরা পর্দার মধ্য হইতে শোনা যায় ঝা-গিন্নী বলিতেছেন, "এতটা বয়স হল; কিন্তু এখনও আমি এসবে একেবারে হকচকিয়ে যাই। ভাগ্যি তুমি ছিলে বহিন। না হলে বিদেশে বিভুঁয়ে কি দশা যে হত এখন, তাই ভাবি।"[৪৭]

কিন্তু রহিকপুরা গ্রামের মানুষগুলোর সব মিল-মহব্বত যে কেবলমাত্র বিপদের সময় — বিপদ উতরে গেলে তারা পুণরায় নিজেদের পূর্বের অবস্থানে কীভাবে ফিরে আসে, লেখক সেই বর্ণনায় উপমা নির্বাচন যেমন যথার্থ, তেমনি বাক্-ভঙ্গির তীক্ষ্ণতা পাঠককে মুগ্ধ করে। আবার তাদের সেই পুরোনো হিংসা-দ্বেষ-জিঘাংসা নিয়ে জেগে উঠতে দেখেছে। তাদের এই চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে সতীনাথ সামান্য উপমার সাহায্যে যেভাবে বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে — "এ কয়দিন বন্যার স্রোতে গ্রামের কলহ মনের পঙ্কিলতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্লাবনের বিশালতার মধ্যে গ্রামীণ মনের সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। পরের দিন গোবরাহা দিয়ারার কালো মাটি জলের মধ্য হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিনের অবচেতন স্বার্থলোলুপ কিষাণ মন আবার চেতন হইয়া ওঠে। অস্বাভাবিক পরিবেশের সমাপ্তির সহিত স্বাভাবিক গ্রামীণ মনও মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ... বন্যার জল সরিতেছে — রাখিয়া যাইতেছে কুটিল সংকীর্ণ মনের ঈর্ষাদ্বন্দ্বের উর্বর ভূমি; কলাইয়ের ও কলহের ফসলের উপযুক্ত ক্ষেত্র।"[৪৮]

এভাবেই সতীনাথ বন্যা গল্পে একদিকে বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতি চিত্রাঙ্কন করেছেন আর সেই সঙ্গে বিহারের রহিকপুরা গ্রামের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের জীবন যাত্রা, জাতিগত বৈষম্য বিভেদকে স্পষ্ট করে তুলেছেন সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সামাজিক গল্পের ধারায় আরেকটি অনবদ্য গল্প 'রথের তলে' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। এই গল্পটিকে সামাজিক গল্পের শ্রেণীতে ফেললেও গল্পটির মধ্য দিয়ে মূলত প্রকাশ পেয়েছে একটি নির্দিষ্ট জাত বা সম্প্রদায়ের মানুষের কথা। সতীনাথ ভাদুড়ীকে ঠিক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত বা তারাশঙ্করের মতো আঞ্চলিক লেখক বলে হয়তো আখ্যা দেওয়া যায় না। তবুও তাঁর লেখায় কখনো কখনো বিহারের কোন কোন অঞ্চল বা অঞ্চলের মানুষ প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসের

মধ্যে 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'-এ যেমন তাৎমাদের জীবন কথা প্রাধাণ্য পেয়েছে, তেমনি 'রথের তলে' নামক ছোটগল্পের মধ্যে নাট সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনকথা প্রকাশিত হয়েছে। 'রথের তলে' গল্পটি প্রথম পুরুষে বর্ণিত একটি কাহিনী। তবে সতীনাথ এখানে একটু বৈচিত্র্য বা নতুনত্ব আনতে চলচ্চিত্র শিল্পের মতো ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। বৃত্তাকার প্লটের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে একটু নতুন ভাবে পরিবেশন করেছেন এখানে। নাট সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন যাত্রা, রীতি-নীতি-সংস্কার, তাদের আদর্শবোধ, পেশার প্রতি সততা এবং স্বাধীনতা উত্তর কালে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে ধীরে ধীরে তাদের অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া — এসব নিয়েই এই গল্পের প্লট রচিত হয়েছে। এখানে গল্পের শুরু হয়েছে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য মেনে কাহিনীর মাঝখান থেকে নয় — কাহিনীর শেষের দিক থেকে। তারপর কাহিনীর প্রয়োজনেই ঘটনার প্রথম অংশ বর্ণিত হয়েছে। তাই গল্পের শুরুতেই দেখা যায় গল্পের মুখ্য চরিত্র ভৈরোনাট — কোন এক গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসেবে চোদ্দ বছর জেল খেটে বাইরে বেরিয়ে আসছে। তার এই জেল থেকে মুক্তির বর্ণনার মধ্য দিয়ে সতীনাথ সুকৌশলে পাঠকের মনে এক বিশেষ কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন, পাঠক জানতে আগ্রহী হয় এই বৃদ্ধ শান্ত স্বভাবের মানুষটি কি এমন অপরাধ করেছিল যার জন্য দীর্ঘ চোদ্দ বছর তাকে জেলে খাটতে হল। ভৈরোনাট যে জাত অপরাধী নয় সেটাও লেখক ইতিমধ্যেই পাঠককে জানিয়ে দেন। তার জেল থেকে ছাড়া পাবার দিনের সকালবেলা জেলের ভিতরের নানা ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার সততার পরিচয় মেলে। অন্য আর সব কয়েদীদের থেকে জেলের সব বাবুরা তাকে একটু অন্য চোখে দেখত। তাই জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার দিন ডেপুটি জেলর থেকে ওয়ার্ডাররা পর্যন্ত সকলেই তার সঙ্গে আর পাঁচটা কয়েদীর থেকে আলাদা আচরণ করে। ডেপুটি জেলরবাবু তাকে বলে — "কিরে, বড় খুশি না? শীত করছে খালি গায়ে? কম্বলটা গায়ে দিয়ে নে, ওখান আর ফেরত দেবার দরকার নেই।"[৪৯] আর জেল অফিসের কয়েদী মেট — "তার সকালের জলপান — একটি গ্লাস ভরা ছোলা ভৈরোর কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিল — 'খোরাকির পয়সাটা বাঁচিয়ে নিস ভৈরো।' "[৫০] এই ভাবেই সতীনাথ প্রথম থেকেই চরিত্রটির প্রতি একটা সহানুভূতির জায়গা তৈরী করে দিয়েছেন পাঠকের মনে।

'রথের তলে' গল্পটির সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে সতীনাথের পারদর্শিতা প্রসংশনীয়। গল্পটির শুরু করেছেন প্রথম পুরুষের বক্তব্য দিয়ে। অর্থাৎ গল্পকথকের বক্তব্য দিয়ে। তারপর গল্প যত এগিয়েছে ততই চমক দিয়েছেন গল্পকার। কোথাও কোথাও নাটকের মতো কথোপকথনও ব্যবহার করেছেন। যেমন — "গেট থেকে বেরুবার সময় গেটের ওয়ার্ডার বলে, 'বিবির কাছে যাওয়ার জন্য বুড়োর আর তর সইছে না। গিয়ে দেখবি বিবি অন্য কারও সঙ্গে ঘর করছে।' ... ওয়ার্ডারের এই মস্করার উত্তরে ভৈরোনাট বলে — 'কি যে বলেন হজুর। একবার গাঁয়ে পৌঁছুতে পারলে হুজুর আর বুড়ো বয়সে হাত পুড়িয়ে

রেঁধে খেতে হবে না। পরিবার না থাকুক, গাঁ খানা তো আছে।' "[৫১] আর এই টুকরো-সামান্য কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন গল্পের রচনারীতিতে চমক এসেছে — তেমনি আবার ভৈরোনাটের নিজের গাঁয়ের প্রতি, গাঁয়ের মানুষের প্রতি অপরিসীম আস্থা বিশ্বাসও প্রকাশিত হয়েছে। এরপর গল্প যত এগিয়েছে ভৈরোনাটের নানা স্বগতোক্তির মধ্যে দিয়ে, তার অতীত স্মৃতি চারণার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তাদের নাটসম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার কথা, তাদের জাতের কঠোর অনুশাসনের কথা — "বাপ ঠাকুরদার কাছে আর দশ জন নাটের মত ভৈরোনাটও ছোটবেলায় শুনেছে তাদের সমাজের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা। দেবতারা তাদের গান শুনতেন। রাজরাজড়ারা ধনদৌলত উজাড় করে ঢেলে দিতেন নাট্টিনদের পায়ে। ... নাটদের সমাজের আবার বিধি-বিধান! ... করুক তো দেখি বেবুদপুরের কোন লোক বিয়ে, নাট জাতের বাইরে। তাকে আর গাঁয়ে ফিরতে হবে না তাহলে। ... কাসিমগড়ের কুমার সাহেবও যদি কোন নাট্টিনকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে সে পর্যন্ত সর্দারের অনুমতি পাবে না।"[৫২]

ভৈরোনাটের এই স্বগতোক্তির মধ্যে দিয়ে সতীনাথ দেখিয়েছেন যে চোদ্দ বছর ভৈরোনাট জেলে ছিল, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরেও সে হঠাৎ করে জেলের জীবন ও বাইরের প্রভূত পাল্টে যাওয়া জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে না। তাই চোদ্দ বছর বাদে জেল খেটে বাইরে বেরিয়ে তার স্মৃতিতে থাকা সেই চোদ্দ বছর পূর্বের সময়টাকেই তার বর্তমান বলে মনে হচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ে কোথায় কী কী পরিবর্তন হয়েছে, বিশেষ করে, দেশ স্বাধীন হবার পরে তাদের গ্রামের কী কী পরিবর্তন হয়েছে, গ্রাম ও গ্রামের মানুষগুলো কেমন আছে তা সে ভাবতে পারে না। সে কেবলই ভাবতে থাকে জেলে আসবার সময় তার গাঁ খানাকে যেমন রেখে এসেছিল, ফিরে গিয়ে ঠিক তেমনি দেখতে পাবে। শুধু পরিবর্তনের মধ্যে যারা সে সময় ছোট ছিল তারা আজ অনেক বড় হয়ে গেছে। তার প্রিয় নাতনী ভুট্‌নী হয়ত বিয়ে-থা করে ছেলের মা হয়েছে। আর এই পুরোনো স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে সে তার গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে — "ভুট্‌নীটার জন্য এক খানা শাড়ি নিয়ে গেলে হয়। কতদিন পরে গাঁয়ে যাচ্ছে; একেবারে খালি হাতে গাঁয়ে ফিরবে? কিছু বাতাসা-টাতাসা কিনে নিয়ে যাওয়া উচিত গাঁয়ের ছেলে মেয়েদের জন্য। এখনকার ছোট ছেলেপিলেরা কেউ তাকে চিনতেই পারবে না। যাদের এতটুকু দেখে এসেছে, তারা আজ বড় হয়ে রোজগার আরম্ভ করে দিয়েছে। নাটেদের মেয়েরা চোদ্দ বছর বয়সের আগেই নাচ-গান শেখা শেষ করে রোজগার করতে আরম্ভ করে।"[৫৩]

ভৈরোনাটের বয়স আটষট্টি বছর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষেরই ফেলে আসা দিনের কথা, পুরোনো স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে। তারপর যদি জীবন স্বাভাবিক স্রোত থেকে বেশ অনেকগুলো বছর জেলের অন্ধকার কুঠুরীতে কাটাতে হয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষেরই হয়ত অতীত-বর্তমানের সমাজস্রোতের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে একটু কষ্ট হবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের সংস্কার বিশ্বাসগুলোও বেশ আঁকড়ে ধরে তাকে। তাই সেক্ষেত্রে বিশ্বাস ভঙ্গের

যন্ত্রণাটাও অনেক বেশী। ভৈরোনাটের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিজের এতকালের বিশ্বাস ভঙ্গের যন্ত্রণাটাও তাই হয়েছে অনেক বেশী। দেশ-কাল-সময়-সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞাত বৃদ্ধ সর্দার ভৈরোনাট যখন স্টেশনে গিয়ে বঙ্গভঙ্গের কথা জানতে পারে, যখন জানতে পারে হিন্দু-মুসলিম আজ আর ভাই-ভাই নেই, হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে তারাও বিভক্ত হয়ে গেছে তখন সে যে কোনো হিসেব মেলাতে পারে না, সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়।

তবে ট্রেনের সহযাত্রীর মুখে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের গল্প শুনে সে সেরকম আমল দেয়নি, তার কেবল মনে হয় আজকালকার ছেলে-ছোকরারা কি সব নতুন নতুন কথা বলে তার মাথা মুণ্ডু নেই। কিন্তু তার কাছে চরম আঘাত হয়ে আসে ট্রেনে পার্বতীপুরে হঠাৎ তার প্রিয় নাতনী ভুট্‌নীকে দেখে এবং তার কাছ থেকে তাদের গাঁয়ের করুণ পরিণতির কথা জানতে পেরে। ভুট্‌নীর কাছে একের পর এক প্রশ্ন করে যায় সর্দার তার গ্রাম সম্পর্কে গ্রামের মানুষ সম্পর্কে — "নতুন মালিক জমিদারীর কাজ কর্ম চালাচ্ছে কেমন? আমাদের গাঁয়ের ওপর সুনজর আছে তো বাপ ঠাকুর্দার মতো? গাঁয়ের খবর কি? সিরি নাট বেঁচে আছে? সে আর আমি এক বয়সী। গুজরী নাট্টিন? ফুদিয়া নাট্টিনের কি ছেলে-মেয়ে?"[৫৪] কিন্তু ভুটনী বুঝতে পারে না সর্দারের কোন্ প্রশ্নের উত্তর দেবে সে। তার চোখ জলে ভরে আসে — কেবলই মনে হয় এই মানুষটাকে সে কষ্ট দেবে, যে মানুষটা নিজেকে শেষ করে দিয়েছে তাদের সমাজটাকে জীইয়ে রাখবার জন্য। কিন্তু ভুটনী তার সর্দার দাদুর কাছে আর মিথ্যে কথা বলে তাকে অকারণ সাময়িক সান্ত্বনা দিতে চায় না। তাই সে সর্দারকে জানায় তার অন্য জাতে বিয়ের কথা। ভুটনীও সর্দারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে লেখক একদিকে নাটসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার কথা জানায়, অন্য দিকে সর্দারের এতদিনের একমাত্র স্বপ্ন তার বেঁচে থাকার একমাত্র পিছুটান তার গাঁয়ের করুণ পরিণতির কথা জেনে তার অভিব্যক্তির কথাও স্পষ্ট করে —

"আমজাদ আলীকে দেখে ভুট্‌নী আরও অপ্রস্তুত হয়ে যায়। হঠাৎ বলে 'এই যে আমজাদ আলী আসছে। সর্দার আমি আমজাদ আলীকে বিয়ে করেছি।'

প্রথমে বিশ্বাস হয় না ভৈরো নাটের। দুষ্টু মেয়েটা আবার তামাসা করছে না তো বুড়োদাদুকে নিয়ে? না, তা তো নয়!

'তুই সমাজের বাইরে বিয়ে করেছিস? ...

হাতুড়ির আঘাত খেয়ে লাল লোহাটার থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ল।

'হারামজাদী'! চিৎকার করে ওঠে ভৈরোনাট। এই দেখবার জন্যে কি সে একটা একটা করে জেলের ভিতর দিন গুনেছে। তার সমাজের আশা-ভরসা সব সে কল্পনায় এই বজ্জাত মেয়েটার মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছিল!

... ভুট্‌নী হঠাৎ পা জড়িয়ে ধরে সর্দারের। — 'আমার কথাটা আগে শুনে নাও সর্দার। ... মেলায় নাট্টিনদের নাচগান বন্ধ করে দিয়েছে মহাৎমাজীরা।' ...

... 'সারঙ্গী পর্যন্ত বেচতে হয়েছিল সর্দার' ...

... আর কোনো উপায় ছিল না সর্দার।"[৫৫]

এতক্ষণে সর্দার একটু ধাতস্ত হয়। কিন্তু এই আঘাত সে সইতে পারে না। মুহূর্তের মধ্যে তার সব আশা-স্বপ্ন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। ভৈরোনাটের এই নিদারুণ কষ্টের অনুভূতিকে সতীনাথ ধরেছেন অসাধারণ ভাষার বাঁধুনীতে। পাঠক যেন চোখের সামনে দেখতে পায় এক দিনের প্রতাপশালী প্রভাবশালী সর্দারের হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় চিত্র —

"আর বলতে হবে নারে ভুট্‌নী, আর বলতে হবে না। কথা কয়টা বলবার চেষ্টা বরল কয়েকবার। গোঙার কাতরানির মতো একটা আওয়াজ বেরোয় গলা থেকে। কিসে যেন ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে কথাগুলোকে ভিতরে। চোখের আগুন ঝিমিয়ে এসেছে কোমলতার ছায়ায়।"[৫৬]

এরপর আর কোন কথা বলার মতো শক্তি থাকে না সর্দারের। বাক্‌রুদ্ধ সর্দার ট্রেন ছাড়ার সময় হলে ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে গিয়ে — "প্লাটফর্মের ওপর কম্বলটা বিছিয়ে, পাটভাঙা শাড়িখান মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে ভৈরোনাট, গড়মোগলাহার গাড়ি যখন খুশি ছাড়ুক।"[৫৭] নেই — যাবার প্রয়োজনও নেই। জীবনের সব প্রয়োজন আজ তার ফুরিয়ে গেছে। একদিন জেলে উপার্জন করা টাকা দিয়ে শখ করে নাতনী ভুট্‌নীর জন্য যে শাড়িখানা কিনেছিল আজ তা বুকে বোঝার মতো চেপে বসেছে। "ভৈরোর ইচ্ছে করে ছুটে চলে যায় সেই টিকিটবাবুর কাছে — শাড়িখান দিচ্ছি হুজুর আপনাকে, আমাকে আবার জেলে পাঠিয়ে দেন, — সেখানকার জগৎটা তবু তার চেনা।"[৫৮]

এই ভাবেই সতীনাথ বুড়ো সর্দারের বুকে পাহাড় প্রমাণ কষ্টটাকে অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, গল্পটিকে সতীনাথ সংলাপ রচনায় বেশি অলংকার প্রয়োগ করেন নি। অকারণ ভাষাকে গুরুগম্ভীর করে উপস্থাপন করেন নি। প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখে মানানসই সংলাপ বসিয়ে চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহার করে গল্পটিকে সম্পূর্ণ বাস্তবরূপ দান করেছেন।

'বন্যা' কিংবা 'রথের তলে' গল্প দুটিতে যেমন সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে জাত-পাতের লড়াই, বর্ণ কিংবা শ্রেণীভেদের মত স্পর্শকাতর সমস্যা, কিংবা কোন নিম্নজাতের মানুষের-শ্রেণীর অবলুপ্তির ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি এই গল্প দুটির বিপরীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সমাজের একটু ভিন্নতর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প 'বয়োকমি' এবং 'কৃষ্ণকলি'। কোন ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সমস্যা কীভাবে ঘরোয়া গণ্ডির পরিসর পেরিয়ে একটা সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়ে যায়; এবং সেই সমস্যা কীভাবে মানুষের জীবনকে তার পূর্বপরিকল্পনা, স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে অনেক দূরে এনে আছড়ে ফেলে — তারই ভাষ্য রচনা করেছেন সতীনাথ 'বয়োকমি' এবং 'কৃষ্ণকলি' গল্পদুটিতে। পূর্বের অধ্যায়ে গল্পগুলির পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জীবন চিত্রণকে

ধরার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে গল্পগুলির বুনন, ভাষারীতি, প্লট, চরিত্রায়ণ এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে শিল্পরূপকে বা বাক্ নির্মাণকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

'বয়োকমি' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) গল্পের প্লট রচিত হয়েছে দুজন ছোটবেলার বান্ধবী আহ্লাদী ও অসীমার দীর্ঘ আঠারো বছর বাদে হঠাৎ সাক্ষাৎ, আহ্লাদীর ছেলে ও অসীমার ভিন্ন কারণজনিত বয়স সংক্রান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে। গল্পটির প্লট নির্মাণে সরলরীতির প্লটের ব্যবহার করা হয়েছে। 'বয়োকমি' গল্পটি রচনারীতি বর্ণনামূলক হলেও, নাটকীয় সংলাপের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। গল্পটির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে কথকের মুখে বা প্রথম পুরুষে। ছোটগল্পের প্রথা মেনেই গল্পটি শুরু হয়েছে কাহিনীর ঠিক মাঝখান থেকে। আহ্লাদী এক ঢিলে দুই পাখি মারার মত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘ আঠারো বছর বাদে তার বড়ো ছেলে সিধুকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছে — এই ঘটনা দিয়েই সতীনাথ গল্পটির সূচনা করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে গল্পের প্রয়োজন মাফিক অতীত আর ভবিষ্যৎ ঘটনার সমান্তরাল পরিবেশনে গল্পটি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে বা ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে পৌঁছেছে।

'বয়োকমি' গল্পের কাহিনীতে রয়েছে — বয়স সংক্রান্ত সমস্যা। গল্পটির আখ্যানভাগে তেমন কোন জটিল-গূঢ় বিষয়কে সতীনাথ নিয়ে আসেননি। তবে বয়স কমানোর মত একটি নিতান্ত সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করেও যে কখনো কখনো জীবনের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিতে পারে — সেটাই সতীনাথ এই গল্পে তাঁর স্বভাবসুলভ সরল অথচ দৃঢ় ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। গল্পে ''স্কুলে ভর্তি হবার সময় আর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তার সময় বয়স কমানোটাই নিয়ম।''[৫৯] এই নিতান্ত সাদামাটা বাক্যের ব্যবহারেই সতীনাথ আমাদের সমাজের একটি চিরাচরিত নিয়মকে (যা মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই নিজেরাই তৈরী করে নিয়েছে) পাঠককুলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তবে এই বয়স কমানোর মত সাধারণ ঘটনাই যে গল্পের দুই প্রধান চরিত্র আহ্লাদী ও অসীমার জীবনে বিরাট সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে তা সতীনাথ পাঠকের সামনে কত দরদী-অনুভবী মন দিয়ে প্রকাশ করেছেন তার প্রমাণ মেলে গল্পে কয়েকটি সংলাপের মধ্য দিয়েই — ''স্কুলে ভর্তি হবার সময় আর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তার সময় বয়স কমানোটাই নিয়ম। এরই জন্য ছেলেটা এনজিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারবে না? বয়স কমিয়ে লেখানোর মধ্যে যে এমন মারাত্মক ব্যাপার থাকতে পারে একথা আহ্লাদী কখনোও কল্পনাও করতে পারেনি।''[৬০]

স্কুলে প্রথম ভর্তি হবার সময় আহ্লাদীর স্বামী তাদের বড়ো ছেলে সিধুর বয়স কমিয়ে দেওয়াতে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর সিধুর আঠারো বছর বয়স পূর্ণ না হবার জন্য সে ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারে না। সুবিধের হিসেব করে বয়স কমানোটাই যে একদিন এভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে দিল তাতে আহ্লাদী দিশেহারা হয়ে পড়ে। ছেলের বয়স কমানো নিয়ে সমস্যা মেটাতে আহ্লাদী গিয়ে হাজির হয় তার ছেলেবেলার বান্ধবী অসীমার বাড়িতে অসীমার

বরের কাছে সাহায্য চাইতে। কারণ অসীমার বর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু সেখানে গিয়ে আহ্লাদী আরও একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার অবস্থা তখন হয় 'কুল রাখি না শ্যাম রাখি'-র মত অসহায়। কারণ অসীমার বাড়িতে গিয়ে সে জানতে পারে অসীমার বিয়ের সময় বয়স কমিয়ে তাকে নিজের আসল বয়সের চেয়ে ছোট বয়সের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন তার অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত বিধবা মা। তাই আহ্লাদীকে দেখে অসীমা বিপদ এড়াতে তাকে জানায় — "শোন আহ্লাদী, তোমাকে একা খুঁজছিলাম। এখনই শ্বাশুড়ি এসে পড়বেন। একটু সাবধান করে দিই। এঁদের কাছে বোলো না যেন তুমি আমার সমবয়সি। এঁরা জানেন যে আমার বয়স এখন তেইশ চলছে। আমার স্বামীর বয়স এখন তেত্রিশ। আমি দু'বছরের বড় তাঁর চেয়ে।"[৬১]

বান্ধবীর কথায় অসীমা উভয় সংঙ্কটে পড়েও কীভাবে নিজের খাঁটি মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দেয়, নিজের ছেলের ক্ষতি স্বীকার করেও বান্ধবীর বিবাহিত জীবন, তার সংসারকে ভেঙে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়, অসীমাকে বাঁচাতে আহ্লাদী প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়ে নিজেকে তার দিদি বলে পরিচয় দেয় — এই বিষয়গুলিকে সতীনাথ যে ভাষা প্রয়োগে স্পষ্ট করেছেন তা অনায়াসেই অনুভবী-সংবেদনশীল পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। অসীমার অনুরোধ রাখতে আহ্লাদী ছেলের ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে পড়াবার স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। এমনকি নিজের সম্পর্কে কোন সত্যি কথাও আহ্লাদী অসীমার শাশুড়ীকে জানায়নি। সর্বোপরি তার সঙ্গে যাওয়া ছেলেটি যে তারই নিজের সন্তান সেকথাও আহ্লাদী কৌশলে এড়িয়ে যায় অসীমার শ্বাশুড়ির কাছ থেকে। আহ্লাদীর এই অভিনয় — এড়িয়ে গিয়ে বান্ধবীকে বাঁচানোর কৌশলটি কতটা বুদ্ধিদীপ্ত অথচ স্পর্শকাতর তা সামান্য উদাহরণেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

অসীমার শাশুড়ী আহ্লাদীর কাছে নিজের পুত্রবধূ সম্পর্কে যখন বলেন — "চার বছর বিয়ে হয়েছে আজও বৌমার সন্তান হল না। এরই জন্য তিনি বৌমাকে নিয়ে তারকেশ্বরে গিয়েছিলেন।"[৬২] তখন আহ্লাদী অসীমার শাশুড়ীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে — "হবে, হবে। বাবা তারকেশ্বরের কৃপায় নিশ্চয় হবে।"[৬৩] এখানে আহ্লাদী অসীমার প্রকৃত বয়স জানা সত্ত্বেও অসীমার শাশুড়ীর কাছে তার কোন ইঙ্গিত না দিয়ে বরং বান্ধবীর হয়ে শাশুড়ীকে আশ্বস্ত করে। এরপরও অসীমার শাশুড়ী যখন আহ্লাদীর বাড়ি-ঘর-স্বামী-সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তখনও আহ্লাদী কৌশলেই সব প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। অসীমার শাশুড়ী এবং আহ্লাদীর মধ্যে সংলাপকে সতীনাথ যেভাবে নাটকীয় রূপ দিয়েছেন তা অতি চমৎকার।

"অসীমার শাশুড়ী ঃ আপনার থাকা হয় কোথায়?

আহ্লাদী ঃ থাকি বিদেশে। বাঃ আপানাদের বাড়িখানি ভারি সুন্দর। আর কি ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছেন। ফুলের টব দেখছি জানালার উপর। ছেলের খুব ফুলের শখ বুঝি? তা তো হবেই। ঠাকুর ঘর নেই?

তেতলায়? চলুন দেখি আপনার ঠাকুর ঘর। বাঃ কি সুন্দর করে সাজিয়েছেন ঠাকুর ঘর!

শাশুড়ী ঃ থাকা হয় বিদেশে কোথায়?

আহ্লাদী ঃ অজপাড়াগাঁ। সেখানে থাকতে থাকতে আমরাও পাড়াগেঁয়ে হয়ে গেছি একেবারে। শিয়ালের ডাক না শুনলে রাতে ঘুম হয় না। কাঁকড়া, গলদা চিংড়ি কিছুই পাওয়া যায়না সে দেশে। .....

শাশুড়ি ঃ আপনার ছেলেপিলে ক'টি?

আহ্লাদী ঃ টিয়া পাখিও আছে দেখছি আপনার বাড়িতে। কোনকিছুর ত্রুটি নেই। ও টিয়া পাখি কি অসীমার? আমাদের ওখানকার ষষ্ঠী তলায় আমি অসীমার নামে একখানা ইঁট বাঁধব। ... আচ্ছা এবার আমরা চলি; আমাদের বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে।"[৬৪]

অসীমার শাশুড়ি আর আহ্লাদীর উপরোক্ত সংলাপ থেকে আহ্লাদীর মনের ভেতরের কষ্টকে পাথর চাপা দিয়ে মুখে হাসি এনে, অভিনয় করে অসীমার শাশুড়ির সব প্রশ্নের উত্তরকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তার মহানুভবতাই প্রকাশ পেয়েছে। একজন পাড়াগেঁয়ে সাধারণ মহিলা হয়েও যেভাবে নিজের বাল্য বন্ধুকে সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তাতে অনেক শিক্ষিতা শহুরে মহিলাকেও মনুষ্যত্ববোধের জায়গা থেকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে সতীনাথ অসীমার শাশুড়ীর সঙ্গে আহ্লাদীর কথোপকথনের সময় আহ্লাদীর মুখে যে সংলাপগুলো দিয়েছেন তাতেই আহ্লাদী চরিত্রটি বাস্তবসম্মত ও নিটোল রূপ পেয়েছে। তবে আহ্লাদীর বান্ধবীর সংসার, তার বিবাহিত জীবনকে বাঁচানোর জন্য বন্ধুত্বের প্রতিদানে সে যতই অভিনয় করুক না কেন — তার মনের গোপনতম কোণে ছেলের জন্য যে কষ্টটা কুঁরে কুঁরে তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল তার বহিঃপ্রকাশ সতীনাথ যেভাবে আহ্লাদীর মৌখিক বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তা যেমন নিখুঁত তেমনি চিত্র রূপময় হয়েছে — "খিলখিল করে হাসতে হাসতে সে বৃদ্ধাকে প্রণাম করে। ... আর পথে, ছেলের কাছে এমন মজার গল্পটা করতে গিয়ে হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল আহ্লাদীর।"[৬৫] এখানে 'খিলখিল' শব্দটির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। বলাবাহুল্য ছেলের কাছে আহ্লাদী তার পুরোনো বান্ধবীর বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনার যে গল্প করছিল তা আসলে আহ্লাদীর কাছে কোন ভাবেই মজার ছিল না। নিজের মনের কষ্ট-ব্যথা যাতে ছেলের কাছে ধরা না পড়ে যায় তাই আহ্লাদী মুখে নকল হাসি এনে চোখের জলকে আড়াল করতে চেয়েছে। আর তাতেই আহ্লাদীর প্রতি পাঠকের সহানুভূতি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আরও দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

সুতরাং সতীনাথ 'বয়োকমি' গল্পে ভাষা, শব্দের বুননে তৈরী সংলাপকে যে কৌশলে ব্যবহার করে প্রতিটি চরিত্রের বিশেষত আহ্লাদী চরিত্রের, সর্বোপরি কাহিনীকে সাজিয়ে তুলে গল্পটিকে পরিণতি দান করেছেন — তাতে গল্পটির বাক্‌নির্মিতি যেমন সার্থক হয়েছে তেমনি শিল্পরূপসম্মত হয়েছে।

'বয়োকমি' গল্পটির মত 'কৃষ্ণকলি' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) গল্পেও রয়েছে এমন একটি সমস্যার

কথা — যা আজকের দিনেও, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমাদের সমাজের একটি অতি পরিচিত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালো-কুরূপা মেয়েদের বিবাহ সমস্যা ও তার করুণ পরিণতিকে কেন্দ্র করেই 'কৃষ্ণকলি' গল্পটির প্লট নির্মিত হয়েছে। সরলরৈখিক প্লটের ব্যবহারেই গল্পের কাহিনী শুরু থেকে ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সুরথবাবুর বিবাহযোগ্যা তথাকথিত কুরূপা কন্যা রেখা। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে কথকের মুখ দিয়ে। গল্পটির রচনারীতি বর্ণনামূলক। কন্যা সন্তান সুন্দরী-রূপসী-ফর্সা না হওয়ার জন্য কীভাবে তার বাবা-মাকে মেয়ের বিয়ের জন্য প্রতি পদে পদে পাত্রপক্ষের কাছে হেনস্থার স্বীকার হতে হয় সতীনাথ এই গল্পটির মধ্যে যেভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন — তা যতটা বাস্তবসম্মত হয়েছে ঠিক ততটাই প্রতিবাদমূলকও বটে। গল্পটি থেকে একটু উদ্ধৃতি তুলে ধরলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে— "এক জায়গায় মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছিল। তারাই একমাত্র পাত্রপক্ষ যারা রেখাকে দেখে পছন্দ করেছিল। ... মা-বাপের নজর কিন্তু ছিল বড় ছোট। ... জানছে যে রেখা মা-বাপের একমাত্র কন্যা — বাপের সব সম্পত্তিই পাবে, তবু খাই মেটেনা কিছুতেই। কথাবার্তা পাকাপাকি হবার পরও দুবার মোচড় দিয়ে দিয়ে যৌতুক আর দান সামগ্রীর পরিমাণ বাড়াল। ... তবুও তিনি না বলেননি কিছুতেই।"[৬৬] উদ্ধৃত অংশ থেকেই স্পষ্ট যে মেয়ের গায়ের রং কালো বলে রেখার বাবা-মাকে পাত্রপক্ষের অনেক অপমানজনক এবং অমানবিক আচরণ সহ্য করতে হয়েছিল। পাত্রপক্ষের নির্লজ্জতা কতদূর এগিয়ে ছিল তা বোঝাতেই সতীনাথ 'মোচড় দিয়ে দিয়ে' এই শব্দ খণ্ডের ব্যবহার করেছেন।

মেয়ের সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু গায়ের রং কালো বলে রেখার বাবা-মা পাত্র পক্ষের অপমান সহ্য করলেও মন থেকে কোনদিনও মেনে নিতে পারেননি। তাই বিয়ের আগের দিন যখন বরের ছোট ভাই এসে পুরোনো দান সামগ্রীর তালিকার সঙ্গে নতুন সংযোজন হিসাবে একটা রেডিওর কথা উল্লেখ করে, তখন রেখার বাবা-মায়ের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। তারা তীব্র প্রতিবাদ করে মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেয় — "আমার পাঁচটা নয় দশটা নয়, ওই একটি মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে আমি অমন বাড়িতে দেব না। ও ওখানে সুখী হতে পারবেনা কোনদিন। ... অত ছোট যাদের মন তাদের ঘরে মেয়ে দেবেন না কিছুতেই। এরজন্য তাদের মেয়েকে যদি আজীবন অবিবাহিতা থাকতে হয়, তাও স্বীকার।"[৬৭] সুরথবাবু ও তার স্ত্রীর এই প্রতিবাদ আসলে স্বয়ং লেখকেরই বটে। লেখক তাই শব্দের বাহুল্যহীন ব্যবহারে, অত্যন্ত সাধারণ বাচন ভঙ্গীতে সুরথবাবু ও তার স্ত্রীর মুখে সংলাপ বসিয়েছেন — তাতে কোন আলংকারিক বা অতিরঞ্জিত বিষয় নেই — বরং তা অনায়াসেই গল্পের সাহিত্যিক গণ্ডীকে অতিক্রম করে আমাদের মনের কথা হয়ে উঠতে পেরেছে।

তবে গল্পটিতে শুধু কালো মেয়েদের বিবাহ সমস্যার কথা বলেই সতীনাথ ক্ষান্ত হননি। এ নিতান্ত অমানবিক ব্যবস্থার জোরালো প্রতিবাদকেও ফুটিয়ে তুলেছেন রেখার বাবা সুরথবাবুর বাস্তব

উপলব্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে। নিজের প্রতিবাদকে যেভাবে সতীনাথ সুরথবাবু চরিত্রটির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন — তাতে লেখক ও তাঁর সৃষ্ট চরিত্র এখানে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। মেয়ের সারা জীবন অবিবাহিতা থাকার জন্য সুরথবাবু মনে মনে নিজেকেই দায়ী করতেন। প্রতি মুহূর্তে তার বিবেকের দংশন আর আমাদের সমাজের এই হীন-অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে সুরথবাবু শেষ পর্যন্ত ছদ্মনামে একটি বই লেখেন — যার নাম দেন 'কুরূপা মেয়ে ও সমাজ'। গল্পে দেখা যায় সুরথবাবুর বইটি প্রকাশিত হবার পর তার Book Review বেরিয়েছে খবরের কাগজে, যেখানে পাঠক-সমালোচক বইটির এবং লেখকের প্রভূত প্রশংসা করে লিখেছেন — "এ বই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য। যাজ্ঞবল্ক্য ছদ্মনামে কে লিখেছেন সেকথা আমরা জানি না। তবে বইখানা পড়ে মনে হয় তিনি একজন আইনজ্ঞ। বইয়ে তিনি এমন একটা সমস্যার কথা তুলেছেন, যা সর্বজনিকতা স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই আমাদের। ... ... বইখানির সবচেয়ে বড় গুণ যে আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লেখকের আন্তরিক দরদ প্রতি ছত্রে অনুভব করতে পারা যায়। .. সর্বশেষে লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে, আমরা এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।"[৬৮]

বলাবাহুল্য, একটি ছোটগল্পের ছোটপরিসরের সতীনাথ নিজের নিগূঢ় বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ করতে গল্পের কাঠামোকে যথাযথ রেখেই, শিল্পগুণকে ক্ষুন্ন না করেও Book Review -এর মত একটি নতুন বিষয় গল্পটির মধ্যে নিয়ে এসেছেন তা যেমন আধুনিক তেমনি প্রশংসনীয়ও বটে। এই গল্পটির রচনারীতি পাঠকের কাছে অবশ্যই নতুনত্বের আস্বাদ এনে দেয়। গল্পের Contant কে ঠিক রেখে আঙ্গিকগত ভাবে যে পরিবর্তন তিনি এখানে ঘটিয়েছেন তা পরীক্ষামূলক হলেও মেধাশক্তির পরিচায়কও হয়েছে। গল্পে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় খবরের কাগজে প্রকাশিত 'কুরূপা মেয়ে ও সমাজ' নামক বইটির Book Review অংশটি আমাদের সমাজে কালো কুরূপা মেয়েদের অবস্থান, তাদের সামাজিক সমস্যা, সমাজের মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন অর্থহীন বাছবিচার এসব নিয়েই নিজের ভাবনা ও জোড়াল প্রতিবাদকেই সতীনাথ সুরথবাবু চরিত্রটি দ্বারা লেখা বই-এর Book Review অংশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে আমাদের সমাজের অনর্থক সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার মানুষের প্রতি ব্যঙ্গবাণও নিক্ষেপিত হয়েছে এই অংশটির মধ্য দিয়ে।

গল্পে বর্ণিত মূল বিষয় কালো মেয়ের বিবাহ সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়ের মানসিকতাকে সতীনাথ যেভাবে তুলে ধরেছেন তা অনায়াসেই পাঠকের কাছে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। খবরের কাগজের একটি খবরকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়ের মধ্যে যে লুকোচুরি খেলা চলেছে তাতে চরিত্র দুটির অন্তরের কষ্ট, যন্ত্রণা সহজেই পাঠক অনুভব করতে পারে। বাবা ও মেয়ের খবরের কাগজকে নিয়ে এই লুকোচুরি খেলাকে সতীনাথ যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে আপাত ছলনার মধ্যে গভীর মনোকষ্টের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ইংরেজী ও বাংলা দুটি খবরের কাগজের

মধ্যে ইংরেজী কাগজটিকে বাবা মেয়ের থেকে আড়াল করতে চান, আর মেয়ে বাংলা কাগজটিকে বাবার চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলতে চায়। এবিষয়টির সামান্য উদাহরণ এখানে অবশ্যই জরুরী — "দৈনন্দিন কাগজখানা মেয়েকে হাতে করে নিয়ে যেতে দেখে সুরথবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অর্থাৎ নিজের হাতের ইংরেজী কাগজখানা এখুনি মেয়েকে দিয়ে দিতে হবে, এটাই ছিল তাঁর ভয়। কালো মেয়েদের সম্বন্ধে লেখা ওই পুস্তক সমালোচনাটা উনি চাননা যে মেয়ে পড়ে।"[৬৯]

"রেখা ওদিকে উনুনে চায়ের জল চাপিয়েই ছুটেছে নিজের ঘরে। নিজের কাগজ থেকে সেও একটা ফোটো সংবলিত সংবাদ কেটে বাদ দিয়ে দিতে চায়, কাগজখানা বাবার হাতে পড়বার আগে।"[৭০] উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ দুটি থেকে বাবা ও মেয়ের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়।

সতীনাথ প্রকৃত অর্থেই ছিলেন সৎ শিল্পী। তাই গল্পকে অকারণ চটকদারিতা থেকে সর্বদাই মুক্ত রেখেছেন। মূল বক্তব্য বিষয়কে দৃঢ় ও সংহত ভাবে, ওজস্বী শব্দ ও বাক্যের ব্যবহারে চরিত্রানুগ করে রূপ দিয়েছেন। কখনোই গল্প লেখার আগে কিংবা পরে পাঠকের অভিরুচির কথাকে অযথা গুরুত্ব দেননি। এই গল্পেও বাকনির্মিতির অংশটির সঙ্গে সমানভাবে প্রশংসার দাবী রাখে গল্প পরিবেশনের নতুন অঙ্গিকটিও। শব্দের পর শব্দ বসিয়েই লেখকেরা তাদের সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাতেই কেউ শ্রেষ্ঠ, কেউবা শ্রেষ্ঠতর হয়ে ওঠেন। বলাবাহুল্য, সতীনাথের সমাজসংস্কারমূলক গল্পগুলিতে সম্পূর্ণভাবে অলঙ্কার বর্জিত ভাষায়, চরিত্রানুগ সংলাপের ব্যবহারে চরিত্রায়ন ও কাহিনী উপস্থাপিত করে সামান্য বিষয়কেও যেভাবে আলোকপাত করে সর্বজন সমক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করেছেন, এবং গল্পগুলির মধ্য দিয়ে যেভাবে নির্দিষ্ট মেসেজ সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছেন তাতে গল্পগুলির যেমন সমাজের অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে তেমনি শিল্পরূপ সম্মত হয়েছে।

সতীনাথের অধিকাংশ গল্পগুলির মতোই 'আন্টাবাংলা' গল্পটিও একটি বিবৃতিমূলক ছোটগল্প। গল্পটির কাহিনী প্রথমপুরুষে বর্ণিত হয়েছে। এখানে গল্পকার অতীত ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গল্পটির কাহিনীকে উপস্থাপন করেছেন। গল্পটির বিষয়বস্তুতে রয়েছে বিহারে নীলকর সাহেবদের নীল চাষ ও তাদের প্রভুত্ববাদের নগ্ন রূপ। অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নীলকর সাহেবদের সমগ্র ইতিহাস। 'আন্টাবাংলা' গল্পটিতে নীলকরদের ইতিহাস, তাদের অসংযমী বিলাসবহুল জীবন-যাপন, ভোগ বিলাসী মানসিকতা — এসবের সঙ্গে সঙ্গে সতীনাথ আর যে বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল — নীলকরদের তিন প্রজন্মের আধিয়াদার বিরসা ওঁরাও, বোটরা ওঁরাওদের কষ্ট সহিষ্ণু জীবন চর্যাকে। বিহারের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারী এই আদিবাসী জনজাতিদের কঠিন জীবন সংগ্রামকেও সতীনাথ এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নীলকর সাহেবদের প্রভুত্ববাদের শিকার হয়ে নির্বিবাদে, নির্বিচারে নিজেদের

জীবনকে সঁপে দিয়েছে অত্যাচারী-লম্পট-নৃশংস নীলকর সাহেবদের হাতে।

শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে শুধু গল্প বলা নয় — সতীনাথ 'আন্টাবাংলা'-র মধ্য দিয়ে বোটরার লড়াই, তার অসীম সহিষ্ণুতা, জীবনের সমাপ্তি-পর্বকে যেভাবে ভাষা দিয়ে রূপ দান করেছেন তা যে কোন সংবেদনশীল পাঠকের কাছেই মর্মস্পর্শী ও লোমহর্ষক। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি যেমন নীলচাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের বর্বরোচিত অত্যাচারের রূপটিকে প্রকাশ করেছে এবং সেই সঙ্গে নীলচাষীদের বিদ্রোহকেউ তুলে ধরেছে, তবে সেখানে নীলকর সাহেবদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু সতীনাথের এই 'আন্টাবাংলা' গল্পটিতে সতীনাথ অত্যন্ত সুকৌশলে নীলকরদের অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমগ্র ইতিহাসটিও তুলে ধরেছেন পাঠকের সমানে। যদিও ছোটগল্পে বিস্তৃত বর্ণনার সুযোগ থাকে না, তবুও সতীনাথ নিজস্ব বর্ণনার বিশিষ্ট কৌশলে বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়েও, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেও পাঠকের সামনে অল্প কথায় তুলে ধরেছেন একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপট। যা থেকে আমরা নীলকর সাহেবদের সমগ্র চিত্রটি জানতে পারি। নীলের চাষ শেষ হবার পরেও নীলকর সাহেবরা কীভাবে নিজেদের আধিপত্যকে বজায় রাখতে চেয়েছিল তার বর্ণনায় সতীনাথ লিখেছেন — "নীল চশমা খোলার পরও, চোখে অনেকক্ষণ রঙের রেশ থাকে। মোকলি, বেটিস, জনস্টন, কীকের দল গ্রামের কুঠি ছাড়িয়া সদরে আসিয়া বাসা বাঁধে, কিন্তু চোখে তাহাদের তখনও পুরাতনেরই আমেজ। নীল চাষ গিয়াছে, কিন্তু জমি তো যায় নাই। রাতারাতি তাহারা পাইতে চায় বনেদী জমিদারের আভিজাত্য।"[৭১] তাঁর বর্ণনার মধ্যে রয়েছে সংকেত-ইঙ্গিতধর্মিতা -স্বল্প কথায় বিষয়কে প্রকাশের অনন্য কৌশল। তাই দেখা যায় বিরসার মৃত্যুর পর তার পুত্রবধূ অর্থাৎ বোটরার মা তাদের চিরকালের সংস্কার ছেড়ে যখন ছোটো বেঞ্জামিন সাহেবের কুঠিতে গিয়ে ওঠে, তখন সতীনাথ বোটরার মার এই বদলে যাওয়াকে কিছুটা ইঙ্গিতধর্মী ভাবে প্রকাশ করেন — "বোটরার মা ছিল পাথর। সেও বদলাইয়াছে।"[৭২] বেঞ্জামিন সাহেব অতি চতুর লোক। তাই বোটরা যাতে তার মার কাছে ঘেঁষতে না পারে সেজন্য বোটরাকে চাকরির টোপ দেয় — 'নৌকরী করোগে, রোজগার?' সাহেব বোটরাকে ক্লাবে টেনিস বল কুড়ানোর ও ছোটোখাটো কাজ কর্ম করার জন্য চাকরিতে নিয়োগ করে। বোটরা সব সময়ের জন্যই ক্লাবে থাকে, মায়ের কাছে আর যায় না। তবে ধীরে ধীরে সে জানতে পারে কেন সাহেব তাকে চাকরি দিয়েছিল, কেনই বা তার মা নিজের ঘর ছেড়ে সাহেবের কুঠিতে গিয়ে উঠেছিল। মায়ের সম্পর্কে বোটরার ধারণাকে সতীনাথ এভাবে প্রকাশ করেছেন — "মা'র সহিত দেখা তাহার আর হয় না বলিলেই হয়। দুই একদিন দেখা হইলে তাহার মাথার তেল এবং পরনে রঙিন শাড়ি দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে, সে বেশ সুখেই আছে।"[৭৩]

তবে আয়তনের দিক থেকে 'আন্টাবাংলা' গল্পটি প্রায় একটি ছোট উপন্যাসের সমান। বর্ণাকৌশল ও উপস্থাপন রীতির জন্যই এটি শেষ পর্যন্ত ছোটগল্প হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে নীলকরদের

জীবনযাত্রার, মোটামুটি বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও সতীনাথ ছোটগল্পের ইঙ্গিতধর্মিতাকে কিন্তু বজায় রেখেছেন। গল্পকারের অপূর্ব ইঙ্গিতধর্মিতায় গল্পের মধ্যেও গড়ে উঠেছে অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প। যেমন গল্পের শুরুতেই বর্ণনাহীন ভাবে সামান্য কয়েকটা শব্দক্রমের মধ্য দিয়ে সতীনাথ নীলকরদের নৃশংস অত্যাচারের ছবিটিকে একেবারে স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন — "মানুষদের কথাই বলি; সমুদ্রের নীল রং দেখিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই, আকাশের নীলের দিকে তাহারা কোনোদিন তাকাইয়া দেখে নাই; কুঠির বড় বড় চৌবাচ্চায় তাহারা দেখিয়াছে গোলা নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয় স্বজনের দেহে দেখিয়াছে নীল কাল শিরার দাগ।"[৭৪]

'আন্টাবাংলা' গল্পটিতে সতীনাথের মূল উদ্দেশ্য ছিল নীলকর সাহেবদের চরিত্র নয় — বিরসা বা বোটরা ওঁরাওদের জীবন সংগ্রামের কথা বলা। বিশেষত বোটরা চরিত্রটি লেখকের সহানুভূতির সঙ্গেই রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। যেমন, বোটরা চরিত্রের সহিষ্ণুতার ব্যাখ্যায় সতীনাথ যেখানে দেখিয়েছেন যে -- বোটরা তার ঠাকুরদা বিরসা ওঁরাওয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী, তার মায়ের বিপথগামিতার জন্য দায়ী, তাদের সুখী পরিবারকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়ার জন্য দায়ী, ছোট বেঞ্জামিন সাহেবকে রক্ষাকর্তা বা ত্রাতা মনে করে তার দেওয়া প্রস্তাবে রাজি হয়ে প্ল্যানটার্স ক্লাবের চাকরিটা হাসি মুখে নিয়ে নেয় কিংবা সব জেনে বুঝেও বোটরা যখন সাহেবের আজ্ঞা বাহক হয়েও ক্লাবে কাজ-কর্ম করে যায় এবং বেঞ্জামিন সাহেবের কাছে সে সর্বদাই এমন ভাব দেখায় যে চাকরিটা পেয়ে সে যেন সাহেবের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ — "বুড়ো বেঞ্জামিন মারা যাইবার পর ছোট বেঞ্জামিন বোটরাকে বলে 'নৌকরি করগে, রোজগার?' বোটরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়।"[৭৫]

সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী একটি ঐতিহাসিক কাহিনীকে নিয়ে রচনা করেছেন গল্পটি। নীলকর সাহেবদের কাহিনী কথা ও তাদের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাওয়া প্রান্ত বিহারের জন সমাজের বিবরণ সতীনাথ এখানে দিয়েছেন। অতীত ইতিহাস নিয়ে গল্প রচনার কারণে ব্যবহার করেছেন সাধুভাষা। কারণ ইংরেজ নীলকর সাহেবরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা সাধু বাংলায়ই কথা বলতেন তার পরিচয় আমরা পূর্বেও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকেও পেয়েছি। কাজেই কাহিনীকে বাস্তবতা দানের উদ্দেশ্যেই সতীনাথ এই ভাষা ব্যবহার করেছেন। গল্পটির কলেবর প্রচলিত রীতির ছোটগল্পের তুলনায় একটু বড় হলেও সংযমী শিল্পী সতীনাথ একটি যুগের বিস্তৃত ইতিহাসকে তুলে ধরতে গিয়ে অকারণ অতি-কথনে ভারাক্রান্ত করেননি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও গল্পের চরিত্ররা বলেনি। এমনই কাহিনীকে স্পষ্টতা দানের জন্য গল্পকার সংযমী-মিতভাষী।

যে কাহিনীটি অনায়াসে উপন্যাস হয়ে ওঠার যোগ্য তাকে সতীনাথ ছোট গল্পের পরিসরে ব্যক্ত করেছেন কাহিনীকে কোনো ভাবে বঞ্চিত না করে। সতীনাথ এই গল্পে দেখিয়েছেন কীভাবে আন্টাবাংলার সঙ্গে বোটরার জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়। আন্টাবাংলার শেষ চিহ্নটুকু যেদিন

মুছে গেল, সেই দিনই হল বোটরার জীবনেরও শেষ দিন। লেখক কি অসীম মুন্সীয়ানার সঙ্গে এই বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন সামান্য উল্লেখেই তা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় — "কালেক্টর সাহেব ক্লাবের একমাত্র পুরাতন সদস্য জলসীনকে বলিয়া আন্টাবাংলার ভাঙা দেওয়াল, ইঁট কাঠ সিন্ধিবোড কনট্রাক্টর পীরুমলকে বিক্রি করেন ... বার রুমের তাহার বেদীটি যেদিন ভাঙা হইল, সেদিন অশ্রু চাপিতে পারে নাই। কতদিনের কত স্মৃতি উহার সহিত মিশানো। শীতকালে গরম আর গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা — যে উহার উপর বসিয়াছে সেই জানে। ... পশ্চিমা হাওয়ায় আন্টাবাংলার ইঁটের গুঁড়া উড়িয়া দিগন্তে মিশিয়া যায় ... রাখিয়া যায় তরাইয়ের নতুন জীবনের জয়যাত্রার রাজপথ — মসৃণ কালো দেহে; নব প্রসূতের রক্ত লেখা।"[৭৬] এই ভাবেই সতীনাথ ইতিহাসের সঙ্গে জীবনের মেল বন্ধনে রচনা করেছিলেন 'আন্টাবাংলা'-র মত গল্প।

আমরা সতীনাথের প্রেম ও দাম্পত্য-সম্পর্কমূলক গল্পগুলির বাক্ নির্মাণ কীরূপ তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। আগের অধ্যায়ে এ গল্পগুলির কাহিনী-চরিত্র প্রভৃতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গল্পগুলির জীবন চিত্রণকে তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ভাষা-সংলাপ-কাহিনীর উপস্থাপন পদ্ধতি, চরিত্রের উপস্থাপন রূপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গল্পগুলির শিল্পরূপকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। সতীনাথের প্রেম ও দাম্পত্য-সম্পর্কমূলক গল্পের আলোচনায় যে গল্পটির নাম প্রথমেই মনে পড়ে যায় — তা হল 'চকাচকী' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। পূর্বের অধ্যায়ে 'চকাচকী' গল্পের কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান এই অধ্যায়ে আমার দেখার বিষয় — সতীনাথ কেমন ভাবে এই গল্পটির বাক্ নির্মাণ করেছেন।

'চকাচকী' গল্পটি উত্তমপুরুষে লেখা সরল রৈখিক প্লটের মধ্য দিয়ে দুটি নর-নারীর অকৃত্রিম প্রেম-ভালোবাসার রূপায়ন। 'চকাচকী' গল্পের সূচনাতেই লেখক পাঠককে মুগ্ধ করেছেন — 'এ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের প্রতি' এই বাক্যটির মধ্য দিয়ে। বলাবাহুল্য, লেখকের এই স্বীকারোক্তি পাঠককে যেমন গল্পটি পাঠে উৎসাহী করে তোলে, তেমনি লেখকের কোনো বিষয়ে সরাসরি নিজের মতামত প্রদানের বিষয়টি গল্পের শুরুতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। 'চকাচকী' গল্পের চকা-চকী হলেন বাহাত্তুরে বৃদ্ধ দুবেজী আর পয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা দুবেনী। সম্পর্কে এরা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু এদের এই সম্পর্ক কতটা গভীর ভালোবাসার বন্ধনে গ্রথিত ছিল লেখকের বর্ণনা থেকেই তা বোঝা যায় —

"ধামদাহা হাটের 'চকাচকী'। চকাচকী নামটি আমারই দেওয়া — যদিও সে নাম পরে জেলা সুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দর্শনেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটি। ঠাট্টা করে নয়; ভালবেসে। হয়তো একটু ঈর্ষাও মেশানো ছিল ঐ নামকরণের সঙ্গে।"[৭৭] কথকের সঙ্গে চকাচকীর প্রথম সাক্ষাতের কথা থেকে পাঠক জানতে পারে তাদের মধ্যেকার নিখাদ বন্ধন সম্পর্কে — "তাদের সঙ্গে আমার

প্রথম সাক্ষাৎ। আমার সহকর্মী কানা মুসাফিরলালের সঙ্গে তখন আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই রাজনীতিক কাজের সূত্রে। মুসাফিরলালই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ধামদাহা হাটের দুবে-দুবেনীর কুটিরে — তখন সেখানে ঘোড়ার দড়ি নিয়ে, হাসি চেঁচামেচির মধ্যে, পুরোদমে টাগ-অব-ওয়র খেলা চলছে। দড়ির একদিকে দুবেজী অন্যদিকে দুবেনী আর অবাধ্য ঘোড়াটি। হেঁইও জোয়ান! — বলেই দুবেজী হঠাৎ দড়ি ছেড়ে দিল। দুবেনী একেবারে চিৎপাত। তবু হাসি থামে না। — দুবেজী নির্দোষিতার ভান করে। — 'জানোয়ারেরা সুদ্ধ তোর দিকে, তোর সঙ্গে কি আমি পারি। তাই হার মেনে ছেড়ে দিলাম।' .... 'দাঁড়াওনা! তোমার জানোয়ারগিরি বার করছি!' "[৭৮]

দুটি বৃদ্ধ নারী-পুরুষের মধ্যে এই ছেলেমানুষ সুলভ আচরণ, তাদের কথাবার্তা শুনেই প্রথম সাক্ষাতেই কথক মুগ্ধ হয়েছিল। আর এই দুটি চরিত্রের প্রতি লেখকেরও কী অপরিসীম ভালোলাগা-শ্রদ্ধা ছিল তাও উপরোক্ত উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়েই স্পষ্ট। বিশেষ করে দুবেনী চরিত্রটির প্রতি লেখকের মনের আন্তরিক দুর্বলতা ছিল। দুবেনী যেন তাঁর চোখে কোনো সাধারণ মানবী নন — কোনো দেবী প্রতিমা। লেখক কীভাবে তাঁর এই 'দেবী প্রতিমা'র রূপ-গুণের বর্ণনা করেছেন তা উদ্ধৃত করলেই পাঠকের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে —

"দুবেনীর বয়স তখনই বছর ষাটেক। তবু কী সুন্দর দেবী প্রতিমার মতো চেহারা! যেমন রূপ, তেমনি গায়ের রঙ। ... আর কী আপন করে নেওয়া ব্যবহার! আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছিল বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এই দম্পতি বিয়ের সময়ের মনের উপছে পড়া ভাব বজায় রেখেছে দেখে। তাই নাম দিয়েছিলাম চকাচকী।"[৭৯]

দুবে-দুবেনী যে সমাজ স্বীকৃত স্বামী-স্ত্রী নয়, তাদের বিয়েটা যে সমাজ অনুমোদিত নয়, তারা যে অবৈধ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে একসময় নিজেদের আত্মীয়-পরিজন, গ্রাম-সমাজ সব ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে এসেছিল গল্পের প্রথম দিকে সেকথা স্পষ্ট করে কোথাও লেখক বলেন নি। কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে একটা ইঙ্গিত পাঠকের জন্য ছেড়ে গেছেন। যেমন — কানা মুসাফিরলাল যখন দুবে-দুবেনী সম্পর্কে কথকের কাছে বাঁকা মন্তব্য করে বলে — "এ গাঁয়ের বুড়োদের কাছ থেকে শোনা যে একটা লোটা আর এই দুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে দুবেজী যখন এখানে এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল — শুধু দুবেনীর কোমরের লচক দেখে।"[৮০] তখনই পাঠকের একটা সন্দেহ উঁকি দেয়। তারপর যখন কথায় কথায় দুবে-দুবেনী নিজেদের পাপ খণ্ডনের কথা বলে তখনও কথকের মতই পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে। দুবে-দুবেনী সর্বদা নিজেদের অভাবের সংসারেও অতিথি সৎকারে উৎসাহী ছিলেন। কথক একদিন দুবেনীকে জিজ্ঞাসা করে — "নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়াতে দেখে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তারা এত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের জন্য।"[৮১]

দুবেনী জবাব দিয়েছিল — "আপনাদের সেবা করলে রামজী খুশী হবেন। তাঁকে খুশী করতে না পারলে আমাদে পাপ খণ্ডন হবে কী করে?"[৮২]

দুবেনীর এই উত্তরে কথকের মনে হয়েছিল —

"এমন সরল নিষ্পাপ পাপের ভয়ে আকুল! তাই রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও রাজনীতিক কর্মীদের জন্য নিজেদের যথাসর্বস্ব খরচ করে দেয়!"[৮৩]

এই সরল নির্লোভ বৃদ্ধ দম্পতি কেন সর্বদা পাপের ভয়ে সিটিয়ে থাকে, কেন সর্বদা পাপস্খলনের কথা বলে তা কথক এবং পাঠকের কাছে একটা বড় জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু গল্পের টানটান উত্তেজনাকে ধরে রাখতে লেখক প্রথমেই একথা জানাননি। গল্পের একেবারে শেষের দিকে পৌঁছে লেখক স্বয়ং দুবেনীর মুখ দিয়েই তাদের কৃত পাপের কথা স্বীকার করিয়েছেন। সে কথা দুবে-দুবেনী দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে চেপে রেখেছে সেকথা দুবেনী কথকের কাছে কেন স্বীকার করেছে তাও লেখক দুবেনীর মুখ থেকেই স্পষ্ট করেছেন —

"এ কি কাউকে বলবার কথা। তবু বলছি। তোমাকে ছাড়া আর তো কাউকে দেখি না বলবার মতো। একজন কাউকে তো বলতেই হবে! চল্লিশ বছর ধরে চেপে চেপে কথাটা একেবারে জমে পাথর হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে! তবু রামজী ক্ষমা করেননি আমাদের। ... ডাক্তার বাবু পরিষ্কার না বললেও ঘুরিয়ে বলেছেন যে, রুগী আর দু-চার দিনের বেশী বাঁচবে না। আমিও সে কথা বুঝতে পেরেছি। ... সেই জন্য একটা কথা বলার দরকার হয়েছে তোমার কাছে। শুনে আমাদের কী মনে করবে তাও জানি। তবু বলছি।"[৮৪] এরপর দুবেনী এত দীর্ঘদিন গোপন করে রাখা কথাটি বলতে শুরু করেন —

"শোনো তবে বলি। যে কথা বলিনি চল্লিশ বছর থেকে। পোড়া মুখ! আমি দুবেজীর নিকট আত্মীয়া। দুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা আমারও আপনার লোক। ফিরবার পথ জন্মের মতো বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসেছিলাম। যাক, সেসব ছেড়ে এসেছিলাম বলে দুঃখ নেই। আমার কথা বাদ দাও! কিন্তু নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না পেয়ে দুবেজী চলে যাবে, তা কি হয়? মুখে আগুনটুকু পাবে না? তবে আর লোকের ছেলে হয় কিসের জন্য? ছেলের হাতের জল পেলে সে পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যেতে পারে। আমার মন যে তাই বলছে। নিজের জন্য ভাবিনা; আমার বরাতে যা লেখা আছে তাই হবে। কিন্তু ওর যে রাস্তা রয়েছে পাপ খণ্ডাবার। তুমি বাবুজী ওর ছেলেকে যেমন করে হোক নিয়ে এস বাড়ি থেকে। সাহাবাদ জেলা, সাসারাম থানা — হরকমাহী গ্রামের পচ্ছিসটোলা। চিঠি দিলে আসবে না। ধরে আনতে হবে। আমি আছি জানলে আসবে না; বলে দিও মরে গিয়েছে; তাহলে এক যদি আসে! ... না কোরো না বাবুজী। আমাকে কথা দিয়েছ!"[৮৫]

'চকাচকী' গল্পের আরও একটি বিষয় যা অবশ্যই বাক্ নির্মিতির অন্তর্গত তা হল চরিত্রদের সংলাপ, তাদের কথনশৈলী, তাদের ভাষা বা শব্দের ব্যবহার। তবে সতীনাথের অন্যান্য অনেক

গল্পের মতই এই গল্পের চরিত্ররা জন্মসূত্রে অবাঙালী, কিন্তু দীর্ঘদিন বাংলার সংস্পর্শে থাকার জন্য তাদের মুখের ভাষা বাংলাই হয়ে গেছে। তবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু প্রাদেশিক (হিন্দি) শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন দুবেজী সম্পর্কে এক জায়গায় দুবেনী বলে —

"মরদ দেখো! মান করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন! থাকো! সবাই কি আর দুবেনী যে তোমার মানের কদর দেবে!"[৮৬]

এখানে 'মরদ', 'কদর' শব্দ দুটি লক্ষণীয়। এই শব্দ দুটি তৎসম, তদ্ভব কিংবা দেশী শব্দ নয়। বিদেশী শব্দ (হিন্দি)। আবার মুসাফিরলাল দুবেনী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছে —

"... তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ির, এখনও কী ঠমক! ছেঁদো কথার কী বাঁধুনি! দেখেন না নেচে চলে! ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াতে চায় চড়ুই পাখির মতো! এ গাঁয়ের বুড়োদের কাছ থেকে শোনা যে একটা লোটা আর এই দুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে দুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায় তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল — শুধু দুবেনীর কোমরের লচক দেখে। সে বয়সে দুবেনী ..."[৮৭]

উদ্ধৃতাংশে 'ঠমক', 'লোটা', 'লচক' প্রভৃতি হিন্দি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। বাংলা ভাষার মাঝে মাঝে একটি-দুটো হিন্দি শব্দ ব্যবহার করে সতীনাথ চরিত্রদের সংলাপে অনেক বেশী জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। বেশ কিছু শব্দের ভিন্ন উচ্চারণও এখানে লক্ষণীয় —

অতিথির > অতিথের, তৈরী > তয়ের

সম্মুখে > সুমুখে, পুরোহিত > পুরুত

'চকাচকী' গল্পটির সঙ্গে যে গল্পটি আলোচনার দাবী রাখে সেটি হল 'দাম্পত্য সীমান্তে'। দাম্পত্য-সম্পর্কের টানাপোড়েন, অন্তঃসারশূন্যতা, প্রেম-ভালোবাসা হীন মিথ্যে দাম্পত্য জীবনের চালচিত্র-পরিণতি নিয়ে লেখা গল্প দাম্পত্য সীমান্তে। পূর্বের অধ্যায়ে সতীনাথ এই গল্পটিতে কীভাবে দুটি নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের ছবিকে তুলে এনেছেন তা বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে লেখক কীভাবে গল্পটির বাক্ নির্মিতিকে সাজিয়েছেন, কীভাবে ভাষা-সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করেছেন তাই অলোচনা করা হবে।

'দাম্পত্য সীমান্তে' গল্পটিতে মূল বা কেন্দ্রিয় চরিত্র দুটি নিবারণ ও তার স্ত্রী অসীমার বিয়ের মাত্র সাত বছরের মধ্যে কেন এবং কীভাবে নিবারণ ও অসীমার দাম্পত্য সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে সতীনাথ অত্যন্ত সহজ-সরল কথ্য বাংলায় তা যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে গল্পটি কেবলমাত্র বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি — তা অনায়াসেই হয়ে উঠেছে অনেক পরিবারেরই 'আঁতের কথা'।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একই সঙ্গে ভালোবাসার, পারস্পরিক আন্তরিকতার ও শ্রদ্ধা বা সম্মানের।

আর এগুলোর কোন একটির অভাব হলেই একটি পরিবারে ভাঙন শুরু হয়। 'দাম্পত্য সীমান্তে' গল্পেও দেখা যায় — সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল নিবারণ আর অসীমার। কিন্তু বিয়ের রাতেই চোখ ভরা স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গিয়েছিল অসীমার।

গল্পের একেবারে শুরুতেই সতীনাথ পাঠককে কৌশলে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন তাঁর গল্পের নায়ক নিবারণের গুণপনা সম্পর্কে — "মাছি ছোটে দূষিত ক্ষতের গন্ধ পেয়ে। নিবারণও চেষ্টা তদবির করে বদলি হয়েছিল আজবপুর পোস্টাফিসে। ডাক-তার-বিভাগের খবর, সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পার্সেল বিলি না হয়ে ফেরত যায় এই পোস্টাফিস থেকে।"[৮৮]

সত্যই আজব জায়গা আজবপুর। আধখানা পড়ে ভারতে, আধখানা নেপালে। নেপালের লোক এই স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে চড়ে; এখানকার পোস্টাফিসে চিঠি ফেলতে আসে — "এখানকার লোক নেপালে বাজার করতে যায়, মদ খেতে যায়। কাজেই এখানকার লোকের চালচলনও অন্য রকমের। এরা ভোজালি দিয়ে তরকারি কোটে; পুলিশের লোক দেখলে ভয় পায় না, আবগারী বিভাগের লোক দেখলে হেসে পানের দোকানে নিয়ে যায়। এই রকম আবহাওয়াই নিবারণ পোস্টমাস্টারের পছন্দ।"[৮৯]

বুদ্ধিমান পাঠক এই সামান্য ইঙ্গিত থেকেই আন্দাজ করে নিতে পারে নিবারণের চরিত্র সম্পর্কে। এরপর গল্প যত এগিয়েছে লেখক নিবারণের স্ত্রী অসীমার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন অনেক অপ্রিয় চরম সত্য নিবারণের চরিত্র সম্পর্কে। বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে নিবারণের এমন কিছু ব্যবহার-আচরণের উল্লেখ করেছেন লেখক যা থেকে তাঁর চরিত্র আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পের থেকে বেশ কিছু উদাহরণ তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন, নিবারণের মদ্যপানের নেশা সম্পর্কে বলেছেন — "বিয়ের পর প্রথম যেদিন জানতে পারে স্বামীর নেশা করার কথা, সেদিন খুব কেঁদেছিল। অমন সুন্দর যার চেহারা, সে মানুষে মদ খায়!"[৯০] শুধু এটুকুই নয়, স্বামীর আরও অনেক গুণের কথাই অসীমা ধীরে ধীরে জেনেছে — "তারপর গত সাত বছরে আরও কত কী জেনেছে, কত কী শিখেছে, কত কী করেছে। যার স্বামীর নেশার খরচ মাইনের চেয়েও বেশী, তাকে অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হয়। ইচ্ছা থাক, আর না-ই থাক।"[৯১]

আজবপুরে আসবার পরই নেপাল বাজারের শেঠজীকে একদিন বাড়িতে এনে পরিচয় করিয়ে দিল অসীমার সঙ্গে। তারপর একটু চায়ের জল চড়াতে বলে বেরিয়ে গেল থলে নিয়ে বাজার করতে। ফিরল ঘন্টা দুয়েক পরে। উপরওয়ালা 'ইন্‌সপেক্‌শনে'-এ এলে তার জন্যও হুবহু এই ব্যবস্থা। তাই নিজের ওপরে স্বামীর ওপরে কষ্টে-রাগে-ক্ষোভে অসীমার কেবলই মনে হয় — "... পণ্য মূল্যের অতিরিক্তি তার কি আর কোনো দামই নাই স্বামীর চোখে। স্বামী সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে মদ। তারপর টাকা। কিন্তু তারপর? ..."[৯২]

একজন স্ত্রীর চোখে তার স্বামীর চরিত্রের এহেন মূল্যায়ন করিয়ে সতীনাথ অনবদ্য দৃষ্টান্ত

স্থাপন করেছেন। উপায়-বিহীন ভাবে অসীমাকে মেনে নিতে হয় নিজের স্বামী নিবারণকে। এই মেনে নেওয়ার নেপথ্যের কারণকেও সতীনাথ স্বচ্ছ-স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করিয়েছেন অসীমার মুখ দিয়েই। স্বামীর দুই নম্বরী-অবৈধ কারবারের জেরে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে অসীমা পুলিশকে জানিয়েছে — "শুনছেন পুলিশসাহেব, এই লোকটাই চুরি করেছে — এই ঠগ, জোচ্চোর, মাতালটা। অন্যর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়ে। সব সত্যি বলব আমি। আমার জেল হয় হোক।"[৯৩]

তবে অসীমা শেষ পর্যন্ত রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে-ঘৃণায় পুলিশের কাছে স্বামী সম্পর্কে সব সত্যি ফাঁস করে দিলেও এর আগে পর্যন্ত পাড়া-প্রতিবেশী-সন্তান সকলের কাছেই কিন্তু স্বামীর দোষকে আড়াল করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালী গৃহবধূর মতো। অসীমা চরিত্রের এই দিকটাও সতীনাথ যথোচিত ভাবেই তুলে ধরেছেন।

এখানে লক্ষণীয় সতীনাথের বর্ণনার কৌশল। অসীমার ছ' বছরের ছেলে ফনটে যেভাবে তাকে মার সমস্ত কার্যকলাপের বর্ণনা করেছে তা তারই মতন পাঠককেও বিস্মিত করে — "... মশারির ভেতর থেকে ফনটে সব দেখছে। যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। মা'র কাণ্ড কারখানা আজ সে ঠিক বুঝতে পারছে না। ... এক মুঠো ভাত মা থালায় রাখল। ডাল তরকারি দিয়ে মেখে সেই ভাতের দলাটাকে সারা থালার উপর একবার বুলিয়ে নিচ্ছে। ডাঁটা চড়চড়িটা থালার একপাশে রেখে আঙুল দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিল। মা দরজার দিকে তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। একবার মশারির দিকেই তাকাল। ও কি! মা ডাঁটা চিবুচ্ছে! এই সাত সকালে! বাসি মুখে! ভুল দেখছে নাকি সে? না, ওই তো ডাঁটার ছিবড়ে বার করে থালার উপর রাখলে। মা তার মশারির দিকে তাকাচ্ছে। এরকম সময় মা'র দিকে তাকাতে নাই, লজ্জা পাবে। তাই ফনটে চোখ ফেরাল জানালার দিকে। রামদেনীর মা আসছে জানালার দিকে।"[৯৪] ফনটে বয়সে ছোট হলেও সবটা বুঝতে না পারলেও মার চালচলন, ক্রিয়াকলাপ দেখে আন্দাজ করে নিতে পারে তার মা অসীমা তার বাবা নিবারণের রাত্রে বাড়িতে না ফেরার বিষয়টি গোপন রাখতে চাইছে কাজের ঝি-র কাছ থেকে। কাজেই ফনটে চরিত্রটির সংলাপ, নির্মাণেও সতীনাথের অসাধারণ পারদর্শিতা সত্যিই প্রসংশনীয়। অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখে ছোট্ট ছেলেটি অবাক্ বিস্ময়ের সঙ্গে যেভাবে তার মনোভাবনাকে এবং তার মায়ের অবাক্ করা কর্মকাণ্ডের বর্ণনা লেখক যেভাবে এই ছ'বছরের ছেলেটির মৌন সংলাপের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তাঁর দক্ষ সৃষ্টিশীলতা নিয়ে পাঠকের মনে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

চরিত্রদের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে সতীনাথ এমন কিছু শব্দরূপ বা শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে চরিত্রগুলি আরো বেশী করে বাস্তব ও নিজের অবস্থানে সাবলীল হয়ে ওঠে। যেমন, এই গল্পে লেখক সর্বত্রই পোস্টঅফিস এই শব্দটিকে একেবারে কথ্য চলিত রূপ দিতে গিয়ে স্বরসঙ্গতির ব্যবহার করেছেন।

পোস্টঅফিস > পোস্টাফিস

আবার — ঠাকুমা > ঠাক্‌মা

এখানে স্বরলোপের ব্যবহার হয়েছে। তবে এই গল্পে প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। গল্পের বীরবাহাদুর নামক নেপালী চরিত্রটির মুখের সংলাপ রচনায়ও এখানে লেখক মান্য চলিতকেই ব্যবহার করেছেন। শুধু 'মাইজী' শব্দটি ছাড়া বীরবাহাদুর আর সব সংলাপই স্পষ্ট চলিত বাংলাতেই বলেছে।

প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কমূলক গল্পের ধারায় ইতিহাসকে অবলম্বন করে লেখা সতীনাথের দ্বিতীয় গল্প 'পঙ্কতিলক'-এ প্রেমের এক সম্পূর্ণ নতুন রূপের সন্ধান দিয়েছেন সতীনাথ তাঁর পাঠককে। আগের অধ্যায়ে আমরা এই গল্পটির কাহিনী ও জীবন চিত্রণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য কাহিনীটিকে আর্কষণীয় করে উপস্থাপিত করার জন্য সতীনাথ কী কী পথ অবলম্বন করেছেন এবং তার প্রচেষ্টা কতদূর সফলতা পেয়েছে, সর্বোপরি গল্পটির বাক্ নির্মাণকে লেখক কেমন ভাবে সাজিয়েছেন এবং তা শিল্প সার্থকতা পেয়েছে কিনা — এ বিষয়টিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

'পঙ্কতিলক' গল্পটি সতীনাথের গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত। মেক্সিকোর প্রাচীন ইতিহাস থেকে গল্পটির বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন সতীনাথ। 'পঙ্কতিলক' গল্পটির বাক্-রীতি আলোচনায় প্রথমেই যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল গল্পটির উপস্থাপন রীতি। এই গল্পে যে বিষয়টি সর্বপ্রথম পাঠককে আকর্ষণ করে তা হল গল্প বলার অভিনব কৌশলটি। একটি চিঠির মধ্যেই বিস্তারিত ভাবে সকল চরিত্র ও তাদের কার্যাবলী, নানা ঘটনা — এসবের পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ ভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে পেরু রাজ্যের ইতিহাস এবং পেরুর রাজা ইংকারাজের পুত্র কুইটো রাজকুমার আথাউল্পার সঙ্গে তার বৈমাত্রেয় ভগিনী তথা ইংকা রাজকন্যা ওলিয়ার প্রেম কাহিনীকে অবলম্বন করে। এই গল্পটির রচনার ক্ষেত্রে সতীনাথ জটিল প্লটেরই ব্যবহার করেছেন। কারণ এখানে কাহিনী সরল বা একরৈখিক গতিতে এগোয়নি। কাহিনীর মধ্যে অনেক টুইস্ট আছে। ইংকারাজের ব্যক্তিগত জীবন, তার সাম্রাজ্য পরিচালনা, স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক, রাজ্য জয় করতে গিয়ে আর ফিরে না আসা, দ্বিতীয় বিবাহ, পেরুতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন, দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র আথাউল্পার সঙ্গে প্রথম পক্ষের কন্যা ওলিয়ার প্রণয় সম্পর্ক এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জয়ী হয়েও আথাউল্পার সঙ্গে ওলিয়ার চির বিচ্ছেদ, ওলিয়াকে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করা প্রভৃতি নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনী রাইজিং অ্যাক্সনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সে এসে পৌঁছায়। একটি চিঠির মাধ্যমে সতীনাথ গল্পটির বুননকে সম্পূর্ণ করেছেন। গল্পটির সূচনাতেই লেখক এই চিঠির উল্লেখ করেছেন — "মাদ্রিদ ঐতিহাসিক মিউজিয়মের উপনিবেশ বিভাগে আছে একখানি পুরাতন চিঠি ..... ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই

সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠি। দিয়োগো ফার্নান্দেজ চিঠি লিখেছেন পেরুর কুজকো শহর থেকে, তাঁর বন্ধু পেড্রো গনজেলোর কাছে।"[৯৫]

সম্পূর্ণ গল্পটি আসলে একটি চিঠি। কিন্তু প্রায় আঠাশ (২৮) পৃষ্ঠার চিঠি — কলেবরের দিক থেকে অবশ্যই খুবই দীর্ঘ। এমনকি ছোটগল্পের আকৃতির পরিমাপ অনুযায়ীও বেশ দীর্ঘ। তবু লেখক চিঠি আকারে এই গল্পে অতীত ইতিহাসের একটি কাহিনীকে এমন ভাবে পরিবেশন করেছেন যে পাঠক গল্পটি পড়তে পড়তে কখনই ক্লান্ত হয়ে পড়ে না, বরং গভীর উত্তেজনা ও কৌতূহলে ইংকা রাজবংশের ইতিহাস এবং ইংকা রাজপুত্র ও রাজকুমারীর প্রেমের কাহিনী শেষ করতে উদ্যত হয়। কাজেই গল্পটির দেহাবয়ব একটু বড় হলেও তা গল্পের কাহিনীকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করেনি। তবে শিল্পরূপের দিক থেকে বিচার করতে গেলে হয়ত সর্বার্থে শিল্পসার্থক আখ্যা দেওয়া নাও যেতে পারে। কারণ ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দেখতে গেলে গল্পটির দেহাবয়ব অবশ্যই শিল্প সাফল্যের বাধার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আসলে সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের শিল্পরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্যই স্মর্তব্য যে সতীনাথ ঠিক 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা/ ছোট ছোট দুঃখ কথা', কিংবা 'বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন' — ছোটগল্পের বিশেষ প্রচলিত এই সকল বৈশিষ্ট্য গুলিকে মাথায় রেখে গল্প রচনা করেন নি। তবে সচেতন ভাবে আবহমান কালের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করেছেন এমনটাও বলা যাবে না। আসলে সতীনাথ যেহেতু আত্মমগ্ন লেখক ছিলেন, বলা যেতে পারে নিজের মনের তাগিদেই কেবলমাত্র তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন — তাই সবসময় সাহিত্যের সব নিয়ম-খুঁটিনাটি ভাবে মেনে চলতে পারেন নি। আর তাছাড়া ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি এমন এমন কিছু কাহিনীতে বিষয়কে রূপদান করেছেন সেগুলি অনায়াসেই ছোটগল্প নয় — উপন্যাসের কাহিনী হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। তাই সবসময় ইচ্ছাকৃত ভাবে না হলেও কাহিনীটি তার চাহিদা অনুযায়ী পরিপূর্ণতা দানে করতে গিয়েও কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ছোটগল্পের স্বাভাবিক পরিসরকে ছাড়িয়ে গেছে। 'পঙ্কতিলক' গল্পটির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। প্রায় কয়েকশত বৎসরের পুরাতন একটি কল্পিত ঐতিহাসিক কাহিনীকে তিনি এখানে রূপদান করেছেন। ভ্রাতা-ভগিনী সূর্য এবং চন্দ্রের দাম্পত্য জীবনকে অবলম্বন করে ইংকারাজ বংশের সৃষ্টির ইতিহাস, ইংকারাজাদের কাহিনী, ইংকারাজ বংশের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন এ সবই পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই গল্পের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে।

গল্পের সূচনাংশের পরেই পত্রলেখক তাঁর বন্ধুকে ইংকারাজ বংশের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে পাঠক সম্পূর্ণ এক নতুন তথ্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে — "সূর্যের মন্দির ঠিক শহরের মাঝখানে। জগতের দুঃখে একদিন জগৎপিতা আর জগন্মাতা থাকিতে না পারিয়া স্বর্গ হইতে পাঠাইয়া ছিলেন তাঁহাদের পুত্র-কন্যাকে। পুত্রের হাতে দিয়াছিলেন একটি সোনার

ফাল। ফালটি এই কুজকোতে আসিয়াই মাটির ভিতর ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই জায়গাটিতেই দাঁড়াইয়া আছে গগনচুম্বী সূর্যমন্দির। এই ভ্রাতা ভগিনীর দম্পতি আরম্ভ হইল ইংকারাজদের রাজবংশ।"[৯৬]

সতীনাথ এই গল্পটিতে যে রচনারীতিকে অবলম্বন করেছেন তা বেশ চমকপ্রদ। অতীত ইতিহাসকে বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতেই চিঠিটির ব্যবহার করেছেন। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে লিখিত এই গল্পটিতে ভাষা ব্যবহারও লক্ষণীয়। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহার করে অর্থাৎ সাধুভাষা ব্যবহার করে কাহিনীটিকে বেশ 'সিরিয়াস' রূপ দান করেছেন। তবে সতীনাথের এই গল্পে ব্যবহৃত সাধুভাষা সম্পূর্ণরূপে ব্যকরণগত গুরুগম্ভীর, কঠিন নয়। বরং বেশ প্রাঞ্জল, সতীনাথ আসলে খানিকটা নিজের মতো করেই ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এখানে। তাই প্রচলিত অর্থে সাধুভাষা বলতে যে গুরুগম্ভীর, তৎসম শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ শব্দবহুল ভাষা বোঝায় এই গল্পে তা আমরা প্রায় পাই না। কাজেই গল্পটি পড়তে অকারণ ভাষা জনিত কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। গল্পে ব্যবহৃত সাধু ও চলিত মিশ্রিত রীতির ভাষা ব্যবহারের একটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে —

"ইংকারাজ দেশে ফিরিয়াছেন কুড়ি বৎসর পর; কুইটো হইতে সঙ্গে আনিয়াছেন উনিশ বৎসর বয়সের যুবক আথাউল্পাকে। আথাউল্পা তাঁহার ছেলে — কুইটোর রাজকুমারীর ছেলে। হুয়ানোকুপাকের মাথার চুল সাদা হইয়াছে, শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কুইটোর নেশা কাটিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের সন্তানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। এতদিন পর রাজধানীর সব জিনিসই নূতন নূতন লাগিতেছে। শহরের সেতুগুলি মেরামত করা হয়নি; রাজ পুরোহিত বার্ধক্যের ভারে ঝুঁকে পড়েছেন; রাজমহিষী কত অভিমান করেই না চলে গিয়েছেন; যুবরাজ হুয়াস্কারের চুলেও দেখছি পাক ধরেছে, এত বয়স হল; সেই রানীর কোল আলো করা এক বছরের ওলিয়া আজ হয়তো কত বড় হয়ে উঠেছে।"[৯৭]

উপরের উদ্ধৃত অংশটি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষা মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আর বলাবাহুল্য, সতীনাথ সচেতন ভাবেই এই ভাষার মিশেল তৈরী করেছেন। হয়ত বা, এর পেছনে লেখকের কোন সুপ্ত উদ্দেশ্য কাজ করে গেছে। কিংবা পাঠক যাতে গল্পটি পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক-সচ্ছন্দ ভাবে কাহিনীটি পরিবেশন করছেন এই ভাষারীতির ব্যবহারে।

এই গল্পের ভাষা ব্যবহারের আলোচনায় আরো যে একটি প্রসঙ্গ না বললেই নয় তা হল — সতীনাথ এই 'পঙ্কতিলক' গল্পটিতে ইংকারাজ্যের ইতিহাস, তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, দেশীয় রীতি-নীতি আচার-আচরণ ছাড়াও আরো একটি সুন্দর বিষয়কে তুলে ধরেছেন তা হল আথাউল্পা ও রাজকুমারী ওলিয়ার প্রেমকাহিনী। আথাউল্পা ও ওলিয়া সম্পর্কে সৎ ভাইবোন। তারা দুজনেই একই পিতার সন্তান। আথাউল্পা ইংকারাজের দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। আর ওলিয়া ইংকারাণীর সন্তান।

রাজকুমারী ওলিয়ার সঙ্গে আথাউল্লার প্রেমের সূত্রপাত ঘটে সূর্য পূজার দিন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আথাউল্লাকে প্রথম দর্শনেই। তারপর দুজনের মধ্যে প্রবাহিত হতে শুরু করে একে অন্যের প্রতি প্রেমাভাব বা ভালোবাসা। কিন্তু বংশের কঠিন নিয়ম দ্বাররক্ষীর মতো বাধা হয়ে দাঁড়ায় দুজনের মধ্যে। তবুও প্রেমের গতি অবারিত। তাই আথাউল্লার সঙ্গে ওলিয়ার প্রেম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর এই গোপন সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে সতীনাথ যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা যেমন পরিমিত তেমনি ওজস্বী — "দুইজনের অন্তরের গহনে যে সকল দিবাস্বপ্নের বুদ্বুদ সংস্কারের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া লীন হইয়া গিয়াছে আজ তাহারা পূর্ণসুষমায় রূপায়িত হইয়া উঠে। কি করিয়া রজনী কাটিয়া যায় তাহারা বুঝিতেও পারে না। পাতাল সূর্যের দ্যুতি কমিয়া আসে। বিদায় লইবার পর ধূপ ঘরের সুবাস ও বিভূতি দুইজনের দেহেই অনেকক্ষণ লগিয়া থাকে।"[৯৮]

এইরকম পরিমিত, সংযত, অনলংকৃত ভাষা ব্যবহার করে সতীনাথ রাজকুমারী ওলিয়া এবং কুইটো কুমার আথাউল্লার প্রেম কাহিনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্যিই যে কোনো পাঠককেই অভিভূত করে। গল্পের শেষে পৌঁছেও ভাষার এই সংযমী অথচ মরমী ভাব গল্পটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। গল্পের শেষে পৌঁছে যখন ওলিয়াকে না জানিয়ে তাকে আত্মহুতির জন্য ধূপ ঘরে নিয়ে যান মঠমাতা এবং জ্বলন্ত আগুনে ওলিয়া একটু একটু করে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন তখনও তার মনে আথাউল্লার প্রতি প্রবল প্রেম ভাব অক্ষত থেকে যায়। — "... এই বার শান্তিতে মরতে পারবো, কিন্তু রাজ্যের প্রজারা জানবে ইংকারাজের সতী সূর্যবংশের সম্মান বজায় রাখবার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন। ... কেবল খেদ থেকে গেল লোকে পুজো করবে ইংকারাজের সতী বলে। এই সুনামের বোঝা, এই সতীত্বের কলঙ্ক নিয়ে আমায় চলে যেতে হল — আথাউল্লা ...।"[৯৯]

উপরে উদ্ধৃত অংশে 'সুনামের বোঝা' এবং 'সতীত্বের কলঙ্ক' শব্দযুগল বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দুটো শব্দের ক্ষেত্রেই পরস্পর বৈপরীত্য ধর্ম বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'সুনাম' শব্দের অর্থ যশ, খ্যাতি বা নামডাক হওয়া। কাজেই এই শব্দটির সঙ্গে সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে ব্যবহৃত 'বোঝা' শব্দটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে সতীনাথ এ ক্ষেত্রে শব্দযুগল কে অত্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ব্যবহার করেছেন নিজের বক্তব্য বিষয়েকে আরও স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা দান করার জন্য। অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপট নিয়ে সতীনাথ 'পঙ্কতিলক' গল্পে যে ঐতিহাসিক এক রাজপরিবারের প্রেম বা রোমান্সের নিদর্শন তুলে ধরেছেন তা যেমন স্বাদে অনন্য তেমনি উপস্থাপন রীতির নতুনত্বে এবং কাহিনী ও চরিত্রের বৈচিত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

একই পুরুষ কীভাবে বাইরে সকলের কাছে, বিশেষত মহিলাদের কাছে ত্রাতা, পরামর্শ দাতা, তাদের পরম নির্ভরশীলতার জায়গা হয়ে ওঠে — আর সেই মানুষটি নিজের স্ত্রী-পুত্র-সংসারের পরম আপনজনদের কাছে অনেক দূরের মানুষ হয়ে থেকে যায় — তারই গল্প 'মহিলা-ইন-চার্জ'

(১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)। 'মহিলা-ইন-চার্জ' গল্পটি একটি মানুষের স্বভাব, চরিত্রের দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ, নিয়েই মূলত লেখা হয়েছে। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে উত্তম পুরুষে কথকের জবানীতে। গল্পটির উপস্থাপন পদ্ধতি বর্ণনামূলক। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র নাটোয়ারলালের জীবন রীতি, তার আচার-আচরণ, চরিত্রের দোষ-গুণ, বিশেষ স্বভাব ধর্মকে কেন্দ্র করেই গল্পটির প্লট নির্মিত হয়েছে। এখানে লেখক এক রৈখিক প্লটেরই ব্যবহার করেছেন।

'মহিলা-ইন-চার্জ' গল্পটি শুরু হয়েছে ছোটগল্পের চিরাচরিত রীতি মেনে কাহিনীর ঠিক মাঝখান থেকেই। গল্প কথকও এই গল্পেরই একজন চরিত্র। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র নাটোয়ারলাল তার পূর্ব পরিচিত। বহু বছর পর হঠাৎ ট্রেনে কথকের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয় নাটোয়ারলালের। নাটোয়ারলালকে দেখেই কথকের স্মৃতির পাতায় উঠে আসে একুশ বছর আগেকার এক রাত্রির কথা — যেদিন নাটোয়ারের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিল। লেখক নাটোয়ারলালের চরিত্রকে দুটো সত্তায় বিভক্ত করেছেন। তাই গল্পে তার চরিত্রে দুটো স্পষ্ট রূপ পাঠক দেখতে পান। নাটোয়ার বরাবরই মহিলাদের খুব প্রিয় ছিল। তবে কোন উচ্চ শ্রেণীর মহিলা নয়, তার সমগোত্রীয় কিংবা কারখানার মহিলা শ্রমিক, গয়লানি, ধোপানী, পাড়ার মহিলারা সকলেই নাটোয়ারকে খুবই ভালোবাসত, পছন্দ করত। গল্পের সামান্য উদাহরণ থেকে নাটোয়ারের এই বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ মেলে — "... স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিশবার তার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হতাম। হাব ভাবের ধরন ছিল তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। কান ধরে টেনে হত কথা বার্তার আরম্ভ। ... মজা হচ্ছে যে, বয়স নির্বিশেষে মেয়েরা তার এই ভাব ভঙ্গি পছন্দ করত, আর পারলে পরেই পাল্টা জবাব দিত, তার গোঁফ আর ভুঁড়ি খামচে ধরে। উভয় পক্ষেরই সহজ সপ্রতিভ ভাব ... আমরা নিত্য দেখতাম মেয়েরা বিনা পয়সায় অফিস কম্পাউণ্ডের চোরকাঁটা পরিষ্কার করতে বা দেয়ালে মাটি লেপতে আসত, শুধু তার সঙ্গে একটু ফষ্টি নষ্টি করবার লোভে।"[১০০]

গল্প-কথকও নাটোয়ারের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলেছেন — "কোন গুণে স্ত্রীলোকেরা তাকে ভালোবাসত ও এমন নিঃসংকোচ ব্যবহার করত, সে কথা আমি কোনদিনই ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে নাটোয়ারলালকে জিজ্ঞাসা করলে সে হাসতে হাসতে বলত, 'কান মললেই দেখবেন ওদের মন গলবে'।"[১০১] এত গেল নাটোয়ার চরিত্রের বহিরঙ্গের স্বরূপ। কিন্তু নাটোয়ারের চরিত্রের আরেকটি অন্তর্নিহিত রূপ ছিল, যা বহুদিন পর্যন্ত নাটোয়ারের সকল পরিচিত জন, সঙ্গী-সাথীদের অজানা ছিল। হঠাৎ একদিন আকস্মিক ভাবে তা সকলের সামনে এসে উপস্থিত হয়। সেই দিনই সকলে জানতে পারে নাটোয়ারের চরিত্রে দ্বিতীয় স্বরূপের কথা। নাটোয়ারলাল ছিল বিবাহিত, কিন্তু নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রামে ছেড়ে এসে সে শহরে একাই বাস করত। স্ত্রীর প্রতি কোনদিন কোন দায়-দায়িত্ব পালন করেনি সে। লেখক নাটোয়ারলালের চরিত্রে এই দিকটিকে যেভাবে স্পষ্ট করেছেন সামান্য

উদ্ধৃতিতেই তা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে — "অফিস বারান্দায় উঠতেই ছড়ি নিয়ে গালাগালি দিতে দিতে এগিয়ে গিয়েছে মহিলা ইন চার্জ 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' -এর জন্য। কিন্তু এ কী? হঠাৎ অবগুণ্ঠনবতীর ঘোমটা ফাঁক হয়েছে। ওদের শ্রেণীর মান অনুযায়ী দেখতে সুশ্রী মেয়ে মানুষটি। থমকে দাঁড়িয়েছে মহিলা-ইন-চার্জ। প্রাথমিক সংকোচ কাটাবার পর এতক্ষণে মুখ খুলল স্ত্রীলোকটির। ... 'মরদ! ভাত কাপড়ে কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই। মোচ কামিয়ে দারোগার বিবি হয়ে বসে আসেন চেয়ারে! এখানে পুলিশের উর্দি পরে ছড়ি হাতে করে মদ্দানি ফলাস, তবে বিয়ে করা বউয়ের কাছে সাত বছরের মধ্যে যাস না কেন?' ..."[১০২]

কিন্তু নটোয়ারলাল কেন তার বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করল না, কেন তার সঙ্গে সারা জীবন কোন সম্পর্ক রাখল না, কেন তার থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াল মহিলা-ইন-চার্জ — তার কোন সদুত্তর বোধহয় কথক তথা লেখকের নিজের কাছেও ছিল না। লেখক বোধহয় পাঠকের ওপরই এর কারণ খোঁজার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন গল্পের শেষে পৌঁছে — "পৃথিবী সুদ্ধু মেয়েরা যার জন্য কাঁদে, সে নিজের স্ত্রীর মন পেলনা কেন জানিনা!"[১০৩] নাটোয়ারলালের বিবাহিতা স্ত্রীর দীর্ঘ সাত বছর পর বিচারের সভায় দারোগা-রূপী বিচারকের বেশে নাটোয়ারকে দেখে যে ভাষায় তাকে গালিগালাজ করেছে তাতে চরিত্রটি এতটাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে গল্পটি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয় এই মহিলাটি কোন গল্পের চরিত্র নয়, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কোন রক্ত মাংসের মানুষ।

'মহিলা-ইন-চার্জ' গল্পে বাক-নির্মিতির আলোচনায় একথা অবশ্যই বলতে হয় যে অত্যন্ত সহজ সরল, নিরলঙ্কার ভাষা ব্যবহার করে সতীনাথ এখানেও তাঁর অনায়াস কুক্ষিগত মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের ভাষা-সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে সতীনাথ চরিত্রের স্বভাব-ধর্ম, পরিবেশ-পরিস্থিতি এই সবকটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে গল্পটির ভাষা বা সংলাপ রচনায় দু-একটি জায়গা অবশ্যই লক্ষণীয়। একুশ বছর বাদে ট্রেনে হঠাৎ কথকের সঙ্গে নাটোয়ারের দেখা হওয়ার পর কথকের মুখের যে সংলাপ তা যেমন বাস্তব তেমনি চরিত্রানুগ গাম্ভীর্যও তাতে রয়েছে — "ও তুমি! নাটোয়ারলাল! কোত্থেকে? কোথায় আজকাল? কোথায় যাচ্ছ?"[১০৪] বহুদিনের পুরোনো পরিচিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে অনেকদিন বাদে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে প্রতিটি মানুষেরই যেমন স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হওয়া উচিত — এই সংলাপেও সেটাই ধরা পড়েছে।

'মহিলা-ইন-চার্জ' গল্পে সতীনাথ মহিলা ইন চার্জ তথা নাটোয়ারলালের দ্বৈত চরিত্রের রূপায়ণে যে ভাষা, যে সংলাপ, যে শব্দের ব্যবহার করেছেন, প্রত্যেকটি চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী এবং সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী যথোচিত সংলাপের ব্যবহারে গল্পটি পাঠকের চোখে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

নারী-পুরুষ অথবা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নিরিখে

কষ্টিপাথরে যাচাই করতে করতে সতীনাথ এমন কিছু বিষয়কে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন যা সাধারণত আমাদের সমাজে একটু ব্যতিক্রমী বা ভিন্ন ধর্মী। এইরকম দুটি ছোটগল্প হল 'পদাঙ্ক' (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) এবং 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ' (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ)। তবে দুটি গল্পের মূল বিষয় দাম্পত্য সম্পর্ক হলেও, গল্পদুটির অন্তর্নিহিত কাহিনী কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। গল্প দুটিকে একসঙ্গে আলোচনায় আনার কারণ এই দুটি গল্পেই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠে এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় কাহিনী বিশ্লেষণ বা অন্তর্পাঠ বিশ্লেষণ নয় — তাই এই দুটি গল্পকে পাশাপাশি রেখে আমরা গল্পদুটির বাক্ নির্মিতিকে ধরার চেষ্টা করব। 'পদাঙ্ক' গল্পে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে প্রথম পুরুষে। গল্পটির উপস্থাপন রীতি সতীনাথের অধিকাংশ গল্পের মতই বর্ণনামূলক। কথকের মুখ দিয়েই পুরো বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। চরিত্রদের পারস্পরিক সংলাপের ব্যবহার হয়েছে খুবই সামান্য। গল্পটির কাহিনী অংশে রয়েছে একজন উচ্চবিত্ত ধনী, বিপত্নীক পুরুষের সঙ্গে একজন অতি সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ষোড়শী কন্যার বিবাহ এবং তাদের দাম্পত্য জীবনে কীভাবে দুই শ্রেণীর (উচ্চবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত) আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, অভ্যাসগত বৈষম্য প্রভাব বিস্তার করে এবং দাম্পত্য জীবনে অসাফল্য এনে দেয় তারই করুণ রসের কাহিনী 'পদাঙ্ক'।

'পদাঙ্ক' গল্পটিতে সতীনাথ সিঁড়ি ভাঙ্গা প্লট বা স্টেয়ার স্টেপ প্লটের সাহায্যে কাহিনী নির্মাণ করেছেন। এখানে গল্পের প্লট রচিত হয়েছে গবাদি পশুর সংকর প্রজনন শাস্ত্রের বিজ্ঞানী ড. বোস সাহেব এবং ড. বোসেরই অধস্তন কর্মচারী ষোড়শী কন্যা রেবার জীবনের বেশ কয়েকটি ধাপ বা পর্ব রচনার মধ্য দিয়ে। যেমন, বোস সাহেবের জীবনে তাঁর প্রথম স্ত্রী এমিলি মেমসাহেবের সঙ্গে কাটান দাম্পত্য জীবন, তারপর বোস সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যু এবং তাঁর একাকিত্ব-বিষাদপূর্ণ জীবন, অতঃপর রেবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ, তাঁর পূর্বের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নতুন করে ভেটেনারী কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী রেবাকে নিয়ে নতুন সংসার পাতা, রেবার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা এবং পুনরায় একাকিত্বময় জীবন — বোস সাহেবের জীবনে এই ধাপগুলির মধ্য দিয়ে গল্পটিও ধাপে ধাপে সমাপ্তির পথে এগিয়েছে। তাই গল্পটির প্লট নির্মাণে সতীনাথের মুন্সীয়ানা অবশ্যই স্বীকার্য। দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে যেভাবে প্লটকে সাজিয়ে তুলে কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাতে গল্পটি শিল্প সুষমায় সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

'পদাঙ্ক' গল্প জুড়ে আমরা যে চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় পাই তারা হলেন গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র বিজ্ঞানী ড. বোস এবং দুই নারী চরিত্র, একজন স্বর্গগতা এমিলি মেমসাহেব, যিনি বোস সাহেবের প্রথম স্ত্রী ছিলেন, আরেকজন ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী বধূ রেবা, যে বোস সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী। তবে সতীনাথ অপূর্ব কৌশলে এই তিনটি চরিত্রকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। বোস

সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে রেবার পূর্ব পরিচয় এবং রেবার প্রতি মেমসাহেবের ভালোবাসা, স্নেহ এসবের যোগসূত্র ধরেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর বোস সাহেবের দ্বিতীয় বার বিবাহ করার জন্য রেবার বাবার কাছে প্রস্তাব প্রদান। গল্প-কথকের জবানীতে সতীনাথ এই ঘটনাগুলোকে যেভাবে সংহত-পিনদ্ধ-কলেবরে কাহিনীকে প্রকাশ করেছেন তার উদাহরণেই পাঠক এই তিনটি চরিত্রকেই স্পষ্ট ভাবে চিনে নিতে পারে — ''মেয়ে-স্কুলের 'স্পোর্টস'-এর দিন এই লম্বা স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি প্রথম মিসিজ বোসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাইজ দেবার সময় রেবাকে একটু আদর করে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'আমাদের বাড়িতে একবার যেও।' ''[১০৫]

এরপর রেবা বাবা-মার কথায় একদিন মিসেজ বোস অর্থাৎ এমিলি মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যায় তাদের সি-টাইপ কোয়ার্টারে — ''কাজেই বাবার চাকরির খাতিরে রেবাকে যেতেই হল, বড় সাহেবের কুঠিতে। সেই হল দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎ মিসেজ বোসের সঙ্গে।''[১০৬] তারপর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন মিসেজ বোস এবং ড. বোসের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বম্বে থেকে সব কৃতকর্ম সেরে মি. বোস যেদিন তাঁর কাজের জায়গায় ফিরে আসেন সেদিন প্ল্যাটফর্মের বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে থেকেও ড. বোসের নজর যায় রেবার দিকে। রেবাকে দেখে ড. বোস স্বগতোক্তি করেন — 'আমার স্ত্রী ওই মেয়েটিকে খুব পছন্দ করতেন।'

অর্থাৎ এই গল্পের একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয় যে, মিসেজ বোস যিনি স্বর্গগতা হয়েও, জীবিত না থেকেও কিন্তু গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছেন। এমনকি পরবর্তীকালে ড. বোসের সঙ্গে রেবার বিবাহের পরও এমিলি মেমসাহেবের উপস্থিতি এতটুকু কমেনি গল্পে এবং রেবা ও বোস সাহেবের দাম্পত্য জীবনে। এমিলি মেমসাহেব চরিত্রটি লেখকের কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ড. বোসের সঙ্গে তাঁর প্রথমা স্ত্রী এমিলি মেমসাহেবের দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন ছিল তারও পরিচয় পাঠক পেয়ে যায়। বিশেষ করে, ড. বোস যে স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ করতেন, কথকের বর্ণনা থেকে পাঠক সে সম্পর্কে অবগত হয়। ড. বোস ও তাঁর প্রথমা স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত মেলে এই সংলাপ থেকেও — ''... বড় সাহেব যেদিনই খুব বেশি মাত্রায় মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে ঘুমুত, সেইদিনই যত কাণ্ড বাড়িতে। মদ খাওয়ার জন্য কিছু নয়; সে তো মেমসাহেব নিজেও মদ খেত। কোন্ সাহেব-মেম না খায়। নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমুলে বড় সাহেবের নাক মুখ দিয়ে ফর্-র্-র্ ফর্-র্-র্ করে একটা অদ্ভুত শব্দ বার হয়। ... অর্ধেক রাত্রিতে ঘুম ভেঙে কানের কাছে ওই শব্দটা শুনলেই তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠত। ... ধাক্কা দিয়ে সাহেবকে খাট থেকে মেঝের ওপর ফেলে দিত।''[১০৭] তবে এই সংলাপ থেকে বোস সাহেব ও এমিলি মেমসাহেবের দাম্পত্য সম্পর্কে বাইরের সকলে যে আন্দাজ করে নিয়েছিল তা যে একেবারেই ঠিক নয় তার প্রমাণ মেলে — ''স্ত্রীকে যে ভদ্রলোক এত ভালোবাসতেন সে কথা সহকর্মীরা কেউ আগে আন্দাজ করতে পারেনি। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি দেখে সকলে

ভাবত তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের নয়; বিলাতে পড়বার সময় ঝোঁকের মাথায় মেম বিয়ে করে পরে বাইশ বছর ধরে তার ঠেলা সামলাতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, স্ত্রী মারা গিয়ে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। কিন্তু সকলের হিসাব গুলিয়ে দিলেন বিপত্নীক বোস সাহেব।"[১০৮]

আবার রেবাকে বিয়ে করার পর বোস সাহেবের নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা, তরুণী স্ত্রীর মন পাওয়ার প্রচেষ্টা এবং রেবারও স্বামীর যোগ্য হয়ে ওঠার প্রতিনিয়ত চেষ্টা এসবের বর্ণনাও বেশ প্রাঞ্জল। এখানে সতীনাথ দুটি অসম বয়সী, অসম মানসিকতার নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে কোন কৃত্রিমতা নেই, কোন বাক্ জটিলতা নেই — অত্যন্ত সহজ-সরল ভাবে সতীনাথ ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে চরিত্র ও কাহিনীর মেল বন্ধনে গল্পটিকে পূর্ণতা দান করেছেন। একজন সাধারণ কর্মচারীর মেয়ে, এ-টাইপ কোয়ার্টারের বাসিন্দা রেবার মনোভাবকে সতীনাথ যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা যেমন বাস্তবসম্মত হয়েছে তেমনি প্রশংসনীয়ও বটে। এমিলি মেমসাহেবের মৃত্যুর পর ড. বোস যখন রেবাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দেন তখন ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা রেবা এক নতুন জীবনের, নতুন জগতের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে পঞ্চাশোর্ধ বোস সাহেবকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়। এই সময় রেবার মনের ভাবনাকে লেখক যে ভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে রেবার বালিকা সুলভ অগভীর চিন্তার সূত্র ধরা পড়েছে — "মাথা জোড়া টাক হলেও বোস সাহেবকে দেখতে রেবার খারাপ লাগে না। বিবাহিত জীবনে অর্থ-সাচ্ছল্য কে না চায়! এত বড় সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবার সৌভাগ্যে সে পরম তৃপ্ত; একজন ইংরেজ মেমের জায়গা নিচ্ছে বলে একটু গর্বিতও।"[১০৯] এই সংলাপ থেকে রেবার বয়সোচিত ছেলেমানুষির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার বিয়ের পরই রেবার রঙিন স্বপ্নের জাল যখন ছিন্ন হয়ে যায়, তখন প্রচুর অর্থ আর বড়লোক স্বামীই যে বিবাহিত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের শেষ কথা নয়, রেবার সেই উপলব্ধিকেও সতীনাথ সামান্য কয়েকটি শব্দেই প্রকাশ করেছেন — "বিয়ে হলে পর, তার বয়সী অন্য মেয়েরা পায় বর; সে পেয়েছে স্বামী। স্বামীর মনের মত হওয়ার মানে সেই মেমসাহেবের মতন হওয়া। সে তো মেমসাহেব নয়; পারবে কেমন করে?"[১১০] রেবা এও উপলব্ধি করে যে অত বড় একজন হোমরা-চোমরা সাহেবকে নিজের জীবনের সব থেকে কাছের মানুষ, সব থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের, ভালোবাসার মানুষ ভাবতে তার বাঁধো বাঁধো ঠেকে।

এভাবেই সম্পূর্ণ গল্প জুড়ে বোস সাহেব-এমিলি মেমসাহেব এবং বোস সাহেব-রেবার দাম্পত্য জীবনের পর্ব থেকে পর্বান্তরকে সতীনাথ শিল্প সার্থক করে তুলেছেন। তবে এই গল্পটির শিল্প রূপের সার্থকতাকে খানিকটা ক্ষুণ্ণ করেছে গল্পে বর্ণিত বোস সাহেবের ওপর ভৌতিক বা অলৌকিক শক্তির প্রভাব অংশটি। বোস সাহেবের মত একজন বিজ্ঞানী কীভাবে কুসংস্কারে আবদ্ধ হলেন, তা সত্যিই পাঠককে অবাক করে। অবশ্য গল্প কথকের জবানীতেও এই ভৌতিক বিষয়টির সম্পর্কে বলতে শোনা যায় — "এ নিয়ে চিটিক্কার পড়ে গেল সারা কলোনীতে। মাথা খারাপ হয়ে গেল

নাকি লোকটার একেবারে? কয়েকদিন এছাড়া আর অন্য কোন কথা নেই এখানকার লোকের মুখে। পুরুষরা নাক সিঁটকল অত বড় একজন বৈজ্ঞানিককে এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর কুসংস্কারের আওতায় পড়তে দেখে।"[১১১] যদিও গল্পের প্রয়োজনেই সতীনাথ হয়ত এই ভৌতিক বর্ণনার অংশটির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, তবুও তিনি যে নিজে কুসংস্কার-মুক্ত মানুষ ছিলেন তা বোঝা যায় উপরোক্ত সংলাপটি থেকে। তাই সব মিলিয়ে চরিত্র চিত্রণ, ভাষা, সংলাপের প্রয়োগ, কাহিনীর উপস্থাপন রীতির নিরিখে 'পদাঙ্ক' গল্পটিকে প্রথম শ্রেণীর গল্প বলা না গেলেও মোটামুটি ভাবে সার্থক বলা যেতে পারে।

'পদাঙ্ক' গল্পে যেমন স্বামীর মেমসাহেব স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ' গল্পটির বিষয়-এর ঠিক বিপরীত। এখানে উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে কখনো কখনো স্বামী কীভাবে স্ত্রীর অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং অত্যাচারের স্বীকার হয়ে নিজের প্রাণ নাশের পথ বেছে নেয় তারই ট্র্যাজিক কাহিনী 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'। গল্পটির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে কথকের মুখ দিয়ে। কথক এখানে গল্পের কোন চরিত্র নয়, কেবল গল্পটি বর্ণনা করেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। গল্পটির উপস্থাপন রীতিতে খানিকটা নাটকীয়তা লক্ষ করা যায়। তবে সংলাপ রচনায় স্বগতোক্তির ব্যবহারই প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পটির রচনা রীতিতে ছোটগল্পের সকল বৈশিষ্ট্যই যথাযথ ভাবে অনুসৃত হয়েছে। গল্পের শুরু হয়েছে মিস্টার মুখার্জির আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনা দিয়ে। তারপর গল্প যত এগিয়েছে ততই ফ্লাশব্যাক পদ্ধতিতে স্পষ্ট হয়েছে মিস্টার মুখার্জির আত্মহত্যার কারণ। 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ' গল্পে প্লট নির্মিত হয়েছে মিস্টার এবং মিসেস মুখার্জির পারস্পরিক দাম্পত্য সম্পর্ক এবং তার ফল স্বরূপ মিস্টার মুখার্জির হঠাৎ আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এখানে সতীনাথ বৃত্তাকার প্লটের ব্যবহারে গল্পের কাহিনীকে পরিণতি দান করেছেন।

'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ' গল্পে মিসেস মুখার্জি চরিত্রটিকে সতীনাথ উপস্থাপন করতে গিয়ে নিজে কোন কথা বলেন নি। অর্থাৎ গল্প-কথকের মুখে মিসেস মুখার্জি চরিত্রটি সম্পর্কে বিশেষ কোন বক্তব্য পাঠক খুঁজে পায় না। চরিত্রটির নিজস্ব আচার-আচরণ, অভ্যাস, স্বামীর সঙ্গে করা আচরণ, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়কে লেখক এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন — যাতে পাঠককে মিসেস মুখার্জি চরিত্রটি সম্পর্কে ধারণা তৈরী করতে অন্যের মুখে ঝালের আস্বাদ নিতে হয় না, পাঠক নিজেই চরিত্রটি সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণায় পৌঁছতে পারে। সামান্য উদ্ধৃতি থেকে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যাবে — "টাকা জমানোর দরকার বলে কি মনের মত পুজোর জামাকাপড়ও হবে না? ... একটার বেশি দুটো কিনলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না কি? দেখতে পারি না এই সব ছোট নজর! মেয়ের বিয়েতে পনের হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে বলে কি একেবারে গরীব হয়ে গিয়েছ? খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দাও, টাকা বাঁচবে! ঝাঁটা মারি অমন টাকায় ... কে চায় তোমার পয়সা। ... এই ড্রাইভার! গাড়ি বার কর। ..."[১১২] কোন চরিত্রকে পাঠককে চিনিয়ে দেবার এই কৌশল হয়ত নতুন

নয় — কিন্তু সতীনাথ তাঁর অধিকাংশ গল্পে এই রীতিটিকে নিজস্ব ভঙ্গিতে ব্যবহার করে পরিচিতির মধ্যেও নতুনত্বের আস্বাদ এনে দিয়েছেন।

মিসেস মুখার্জি চরিত্রটি সম্পর্কে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হয় এই সংলাপটির মধ্য দিয়েও — "কী তিরিক্ষি মেজাজ। তেমনি নাক সিটকানো সবটাতে। ... আরে বড়লোকের বাড়ির মেয়ে হল তো কী হল? সেই দেমাকেই ধরাকে সরা জ্ঞান করে — স্বামীকে সুদ্ধ।"[১১৩] মিসেস মুখার্জির পাশাপাশি মিস্টার মুখার্জি চরিত্রটি সম্পর্কেও পাঠকের একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা হয় গল্পে বর্ণিত সংলাপ থেকে — "ভদ্রলোক অমন কাণ্ড করতে গেলেন কেন? ... অতবড় চাকরে। ভালো মানুষ। ঠাণ্ডা মেজাজ। হিসাবি। ঘোড় দৌড়, শেয়ার মার্কেট বা কোন বদ খেয়াল নেই। গীতা পাঠ না করে জল স্পর্শ করেন না।"[১১৪] মিস্টার মুখার্জির আত্মহত্যা করাটা যে একেবারেই স্বাভাবিক নয় এবং এর পেছনে যে তাঁর স্ত্রী বহুলাংশে দায়ী তার ব্যখ্যাও গল্পে রয়েছে — "হ্যাঁ হ্যাঁ বোধহয় তাই। বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই তাই। পারিবারিক অশান্তি, 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ' এর স্বভাব তো কারো অজানা নয়। ... নইলে যে লোকটা অফিস থেকে বাড়িতে এসে লাঞ্চ খেয়েছে, সেই লোকটা তার খানিক পরেই বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বন্দুকের গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করবে কেন?"[১১৫]

এভাবেই এই গল্পে সতীনাথ দুটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশেষত মিসেস মুখার্জি চরিত্রটির অন্তর্গত সংলাপ এবং কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তাদের মিথ্যে দাম্পত্যের চিত্রকে পরিস্ফুট করেছেন।

পরিচিত বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে নারী-পুরুষ তথা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের আপাত বহির্রূপের অন্তরালে যে অন্তর্নিহিত রূপ রয়েছে — তাকেও তুলে এনেছেন সতীনাথ তাঁর 'পূতিগন্ধ' (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) গল্পটির মধ্য দিয়ে। গল্পটির প্লট রচিত হয়েছে নাজিরবাবুর অসৎ আচরণ-অসৎ চরিত্রের কারণে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দূরত্ব এবং পরিণতিকে কেন্দ্র করে। প্রথম পুরুষে বর্ণিত গল্পটির সূচনাই পাঠককে বুঝিয়ে দেয় কাহিনীর এবং চরিত্রের মনোপ্রকৃতিকে। গল্পে মূল চরিত্র দুটি — মৃণালিনী এবং তার সদাশিব স্বামী সরকারি অফিসের নাজিরবাবু। লক্ষণীয় যে এই গল্পে সতীনাথ নাজিরবাবু চরিত্রটির কোন নাম ব্যবহার করেননি, তাঁর কর্মস্থলের পদ অনুসারে গল্পে তাঁর নামকরণ হয়েছে নাজিরবাবু। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের তিক্ততা বা দূরত্বকে প্রকাশ করেছেন নিতান্ত সাদামাটা ভাষায় মৃণালিনীর উপলব্ধিজাত গভীর ক্ষোভের বহিপ্রকাশের মধ্য দিয়ে — "... এতদিনে ষোলকলা পূর্ণ হল। যেদিকে তাকাও অন্ধকার। যেদিকে পা বাড়াও, হোঁচট খাবে। ইচ্ছা থাকলেও কিছু করার নেই। কোন উপায় কি রেখেছে সেই লোকটা। যে লোকটার হাতে মা তাঁকে সাতপাক দিয়ে সঁপে দিয়েছিল, নিজে কোন রকমে দায়মুক্ত হবার জন্য। হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারল না? যবে থেকে এ বাড়িতে এসেছি, তবে থেকে জ্বলে পুড়ে মরছি। কুকুর-বিড়ালের মতো দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দিয়েছে ঠিকই; কিন্তু

কোনদিনও একটা ভালো করে কথা বলেছে?"[১১৬] স্ত্রীর চোখে স্বামীর চারিত্রিক স্খলনকে যখন প্রকাশ করেছেন তখনও ভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয় — "এমন যার বৈরাগী বৈরাগী ভাব, একটা বউ মরলে সে আবার বিয়ে করতে যায় কেন? বছর বছর কুকুর-বিড়ালের মতো ছেলে পিলেই বা হয় কেন তার? যে জিনিসগুলোকে দশ জনে খারাপ বলে, টান শুধু সেইগুলোর উপর! ছি ছি ছি! এত স্বার্থপর! এত অবুঝ! নিজের বদ খেয়ালটাই হল আসল! ভাসিয়ে দিয়ে গেল সকলকে! জেলে পচে মরাই উচিত ওরকম লোকের! ..."[১১৭] একজন স্ত্রী যার স্বামীর সঙ্গে সবচেয়ে নিকটতম, নিবিড়তম সম্পর্কে আবদ্ধ থাকা উচিত, সে কতখানি আঘাত পেলে, স্বামীর আচরণে কতখানি তিতি বিরক্ত হলে এধরণের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে, তা পাঠক অনায়াসে আন্দাজ করে নেয় মৃণালিনীর উপরোক্ত সংলাপটি থেকে।

মৃণালিনীর সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক কোনদিনই মধুর ছিল না। কারণ মৃণালিনী ছিল তার স্বামীর দ্বিতীয়া স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর পঞ্চাশোর্ধ নাজিরবাবু গরীব বিধবার মেয়ে মৃণালিনীকে বিয়ে করেছিলেন। মৃণালিনীর সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক ঠিক কেমন ছিল তা আন্দাজ করে নেওয়া যায় একটি সংলাপ থেকে — "গরীব বিধবার মেয়ে তিনি। দোজবরে বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পেরে বিধবা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন। আর সেই প্রথম দিন থেকেই অত বড় চেহারার গম্ভীর প্রকৃতির প্রৌঢ় লোকটির সঙ্গে মৃণালিনীর যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, সেটা ভয়ের।"[১১৮] তবে মৃণালিনী চরিত্রের এই দিকটির সঙ্গে সঙ্গে সতীনাথ আরেকটি দিকও স্পষ্ট করেছেন। আর পাঁচটা বাঙালী পতিব্রতা নারীর মতই মৃণালিনীও নিজের মনের দুঃখ-কষ্ট-ক্ষোভকে চেপে রেখেই যেমন সংসারের সব দায়িত্ব কর্তব্য পালন করত, তেমনি স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক যতই খারাপ হোক না কেন, স্বামীকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও — সমাজের লোকের কাছে, বাইরের লোকের কাছে স্বামীর দোষকে তিনি যেভাবে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন তাতে তার পতিব্রতা রূপটি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার স্বামী নাজিরবাবু অফিস থেকে টাকা চুরির দায়ে জেলে গেলে মৃণালিনী স্বামীর সব দোষ জেনেও তাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন — "পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে অযাচিত ভাবে বলা আরম্ভ করেছেন যে, নাজিরবাবুর সব টাকা খরচ হয়েছে তাঁর সংসার আর ছেলে মেয়েদের জন্য। ... ছেলে মেয়েদের শিখিয়ে দিলেন বন্ধুদের কাছে এইভাবে কথা বলতে।"[১১৯] অথচ এই মৃণালিনী যখন প্রথম স্বামীর এই অপরাধের কথা জানতে পারেন তখন তার যে কথা মনে হয়েছে — "পাড়ার লোকে আর অফিসের আরদালীদের মুখে শোনা যে নাজিরের চাকরিতে উপরি রোজগার বেশ আছে। আছে ঠিকই; কিন্তু মাইনের পঁচাশি টাকার অতিরিক্ত এক পয়সাও স্ত্রী কখনও স্বামীর কাছ থেকে পাননি।"[১২০] মৃণালিনীর এই বক্তব্যের সঙ্গে উপরোক্ত বক্তব্যটির অমিল তার চরিত্রের কোন দোষ বা ত্রুটি নয়। কেবল নিজের স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্যই মৃণালিনী জেনে শুনেই মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এইভাবে 'পূতিগন্ধ' গল্পে সতীনাথ বর্ণনাধর্মী কাহিনী কথনের মধ্য দিয়ে, মৃণালিনী চরিত্রটির

বিশেষ উপলব্ধি ও আচরণ এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে, বাহুল্যবর্জিত, অলংকার বিহীন এবং প্রয়োজন মাফিক ক্ষিপ্রগতির ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের চেনা রূপের আড়ালে থাকা অচেনা রূপটিকে স্পষ্ট করেছেন। সংসার যন্ত্রে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতিকার বিহীন, কোনঠাসা অবস্থার নিদারুণ অসহায়তাকে সতীনাথ এখানে তুলে ধরেছেন শান্ত-নিরুত্তাপ বর্ণনা কৌশলের মধ্য দিয়ে। যেখানে দাঁড়িয়ে মৃণালিনী সংসার ও সমাজের দায়বদ্ধতার খাতিরে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও স্বামীর সঙ্গে আদালতে দেখা করতে যান এবং তার জন্য মামলা লড়ার উকিলের ব্যবস্থাও করেন। তবে এসবের মধ্যে থেকেও প্রাতিষ্ঠানিক দাম্পত্যের সাফল্যহীনতা স্পষ্ট হয়েছে গল্পটির শেষ একটি বাক্যে — "ছাতার বাঁটের দম আটকানো গন্ধটা এতক্ষণে আবার পেলেন মৃণালিনী ...। গা ঘিন ঘিন করে উঠেছে।"[১২১]

নারী-পুরুষের সম্পর্কের রসায়ণ নিয়ে সতীনাথের একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প 'অপরিচিতা' (১৩৬০ বঙ্গাব্দ)। বিদেশের পটভূমিতে লেখা সতীনাথের একটি গল্প 'অপরিচিতা'। গল্পটির পটভূমি লণ্ডন শহর। গল্পটি প্রথম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে। গল্পের কথক বিলেতে থাকে — প্রবাসী ভারতীয়, ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার জন্য তিন বছর আগে ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন। গল্পে আরেকটি চরিত্র পাই — কথকের বন্ধু মিঃ দত্ত। তিনিও চার বছর আগে এদেশে এসেছিলেন ব্যারিস্টার হবার জন্য। কিন্তু ব্যারিস্টারির সব পরীক্ষায় তার পাশ করা হয়ে ওঠেনি। এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী চরিত্রের মানুষকে নিয়ে হালকা চালের-লঘুরসের গল্প 'অপরিচিতা'।

দুটি বিপরীত ধর্মী চরিত্রের মানুষের স্বভাব-আচার-বৈশিষ্ট্য নিয়ে গল্পটিকে সাজিয়ে তুলেছেন সতীনাথ। গল্পটির কাহিনী খুব জোরালো কিছু নয়। একদিনের বিকেলবেলার দুই বন্ধুর কথোপকথন, রেস্তরাঁয় যাওয়া — এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সতীনাথ এই গল্পটির কাহিনী নির্মাণ করেছেন। গল্পটির নাম থেকেই বোঝা যায় — গল্পে একটি মহিলা চরিত্রের প্রাধান্য রয়েছে। যে চরিত্রটি কথক এবং তার বন্ধু মিঃ দত্তের পূর্ব পরিচিতি নয় — তাই সে অপরিচিতা। এই মহিলা চরিত্রটি কিন্তু কাহিনীর প্রথম থেকে নেই — কাহিনীর একদম শেষ দিকে চরিত্রটির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মহিলার কোন নাম গল্পে নেই। মূলত গল্পটিতে কথক এবং তার বন্ধু মিঃ দত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য এবং মেয়েদের সম্পর্কে তাদের অভিরুচি এসব গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয়কেও লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন সামান্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে, তা হল — বিদেশি ভদ্রমহিলাদের প্রকৃত ভদ্র, অত্যন্ত সংযত অথচ দৃঢ় পরপোকারী চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে।

গল্পটির সংলাপ রচনায় সতীনাথের কৌশল অত্যন্ত সুন্দর। দুই বিপরীত ধর্মী মানুষের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, একেবারে জীবন্ত। কথকের মুখ দিয়েই দুটি চরিত্রের বর্ণনাকে উপস্থাপিত করেছেন। গল্পের প্রথম দিকেই কথক পাঠককে তার

বন্ধুর চারিত্রিক ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করতে লেখেন — "দত্ত বড়লোকের ছেলে ব্যারিস্টারির ছাত্র। চার বছর আগে এসেছে বিলাতে, কিন্তু সব পরীক্ষাগুলো পাশ করা তার হয়ে ওঠেনি। যে কোনো গল্পই আরম্ভ কর না তার সঙ্গে, সে তার মধ্যে মেয়েদের প্রসঙ্গ আর প্রেমের রাজ্যে নিজের দিগ্বিজয়ের অসংখ্য কাহিনী এনে ফেলবেই ফেলবে। আমি যতদূর বুঝেছি, প্রেমে বিজয়লাভ বলতে সে বোঝে একজন সদ্য পরিচিত মহিলার সঙ্গে রেস্তরাঁয় অনেকক্ষণ বসে খাওয়া এবং তারপর সময় থাকলে বড় রাস্তার উপর দিয়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ানো। এই নিয়েই তার এত লম্বা লম্বা গল্প এত লম্ফঝম্ফ।"[১২২] কথকের এই অল্প বিবরণ থেকেই তার বন্ধু মিঃ দত্তের ছবি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। কেবল বড়লোকি চাল আর বড় বড় বাতেলা দেওয়াই মিঃ দত্তের স্বভাব। বলা যেতে পারে বড়লোকের বিগড়ে যাওয়া ছেলে হল মিঃ দত্ত।

কথক যেমন তার বন্ধুর চারিত্রিক স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে পাঠকের কাছে জানিয়েছেন, তেমনি নিজের সম্পর্কে জানাতেও কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। নিজের সম্পর্কে কথকের অভিব্যক্তি — "প্রায় তিন বছর এদেশে হল। কিন্তু এতদিন পড়াশোনার দায়িত্ব মাথায় থাকায় এদেশকে উপভোগ করতে পেরেছি খুবই কম। লোকজনের সঙ্গে ভাসাভাসা পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আলাপ জমেনি। সত্যি কথা বলতে কি লোকজনের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা আমার নেই। বুড়ী ল্যাণ্ডলেডি ছাড়া অন্য কোন ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধা আমার হয়নি।"[১২৩]

এহেন বিপরীত ধর্মী দুটি মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হল কীভাবে তা অবশ্যই পাঠককে ভাবায়। কিন্তু এর কারণও লেখক কথকের মুখ দিয়ে আমাদেরকে জানিয়েছেন —

"নাচতে জানি না, খেলাধুলোয় রুচি নেই, বড়লোকের ছেলে নয়, আমার মতো লোক নতুন আলাপ জমাবার সুযোগ পাবে কি করে এদেশে! সাধে কি আর দত্তদের দলে ভিড়বার চেষ্টা করছি ইদানীং! আমার মতো আনাড়ীকে তালিম দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে একটু চালাকচতুর করে দেবার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। যে তার সবজান্তা ভাবটাকে স্বীকার করে নেয়, তাকেই দত্ত বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেয়। আমার চেয়ে এক বছর আগে বিলাতে আসবার দাবিতে, সে নিজেকে সব বিষয়ে অনেক উঁচুতে মনে করে। আমিও নির্বিরোধে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিই বলেই সে আমার উপর এত সদয়।"[১২৪]

গল্পটির উপস্থাপন পদ্ধতিতেও লেখক বেশ নতুনত্ব এনেছেন। কখনো কথকের মুখ দিয়ে ঘটনার বর্ণনাও করেছেন, আবার কখনো দুই চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাই কাহিনীতে তেমন কোনো গুরু-গম্ভীর বিষয় না থাকলেও পাঠক গল্পটি পড়তে উৎসাহ হারায় না। বরং দুই বন্ধুর সংলাপ থেকেই পাঠক কাহিনীর রস খুঁজে নিতে চেষ্টা করে। ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে যাওয়ার পর করোনেশন দেখবার জন্য থেকে যায় কথক। পড়াশোনার চাপ নেই, তাই দিন কয়েকের জন্য নিজেকে বন্ধু মিঃ দত্তের হাতে সঁপে দিয়েছে

ইংল্যাণ্ডের সব কিছুকে উপভোগ করার জন্য। এরকমই একদিন ঠিক হয় দুই বন্ধু রেস্তরাঁয় যাবে। বন্ধুকে দেওয়া কথা মত কথক ঠিক সময়ে উপস্থিত। কিন্তু তার বন্ধু নিজের অভ্যাস বশত দেরি করে আসে এবং ফিরিস্তি দিতে শুরু করে। এমতাবস্থায় দুই বন্ধুর মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা উল্লেখে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় মিলবে —

''দেরি করে ফেললাম না কি? লিজা কিছুতেই ... দত্ত এসে গেল তাহলে।

তাকিয়ে দেখি সে ঘড়ি দেখছে। লিজার গল্প এখনই শেষ করে লাভ নেই। ...

না না দেরি আর কি। আমিও তো এই আসছি। চল!

সম্মুখের 'কর্নারহাউস' রেস্তরাঁয় আমাদের যাবার কথা ছিল। খাবারের ট্রে নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম।

'নতুন স্যুট তয়ের করালে যে দেখছি।

হ্যাঁ, দেশে যাওয়ার আগে একবার করিয়ে নেওয়া গেল।'

'বুঝেছি বুঝেছি দাদা, করোনেশনের মরশুমে কাজে লাগবে। ঠিকই করেছ। অপরিচিতাদের সঙ্গে আলাপ করতে হলে ভাল দরজী-বাড়ির স্যুটই হচ্ছে প্রারম্ভিক পাসপোর্ট এদেশে।'

'না না সেজন্য পোশাক তয়ের করাইনি। আর আমার মতো চেহারায় যত দামী স্যুট পরিনা কেন, কোনো মেয়ে ফিরেও তাকাবে না।' ''[১২৫]

এই ভাবে দুই বন্ধুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখক কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে সেই অপরিচিত সবুজ পোষাক পরিহিতা মহিলাটির আচরণের মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন বিদেশি মহিলাদের আচার-আচরণ, স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে। যে মানুষটি তাকে উতক্ত করেছিল সেই মানুষটিকেই আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে, তিনি নিজের সহজাত ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। রাস্তায় অপরিচিত কোন মহিলাকে উতক্ত করার অপরাধে পুলিশ যখন এসে কথককে জিজ্ঞাসা করে তুমি ওই ভদ্র মহিলাটিকে কি বলছিলে? তখন কথকের বিপদ আসন্ন দেখে সবুজ পোষক পরিহিতা মহিলাটি ফিরে এসে তাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বলে — ''আচ্ছা, কাল তিনটের সময় তোমায় আমি ফোন করব বুঝলে? এখন আসি! আবার কাল ফোনে জানাব, কখন তোমার বাড়িতে যাব।''[১২৬] ভদ্র মহিলার এটুকু কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় তার চারিত্রিক গুণাবলী। সামান্য বিষয়কে অবলম্বন করেও যে কত সুন্দর গল্প লেখা যায় অপরিচিতা গল্পটি তারই প্রমাণ। এই গল্পে লেখকের Approch খুবই আধুনিক। গল্পের কাহিনী, ভাষা, বর্ণনারীতি সর্বত্রই তাঁর আধুনিক মনস্কতার ছাপ স্পষ্ট। এভাবেই বিদেশের পটভূমিকায় লেখা এই গল্পটিতে সতীনাথ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এবং পাশ্চত্যের নারী সমাজের শিষ্টাচারকে তুলে ধরেছেন।

সতীনাথের প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কমূলক গল্পগুলির বাক্-নির্মিতি তথা সামগ্রিক শিল্প রূপের

বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে — সতীনাথ তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ, পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বহৃদয় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নর-নারীর প্রেম-অপ্রেম, ভালোবাসা-ঘৃণা প্রভৃতিকে রূপে-রসে, ভাষায়-ব্যঞ্জনায়, আঙ্গিকে-কথনশৈলীতে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য মর্মস্পর্শী করে পরিবেশন করেছেন, তাই তাঁর নর-নারীর প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কমূলক গল্পগুলি হয়ে উঠেছে প্রচলিত রূপ ও ধারণার বিপরীতে কঠিন-কঠোর বাস্তব সত্যের অনালোকিত দিকের চিত্রাবয়ব।

সতীনাথের ছোটগল্প রচনার ধারায় একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে তাঁর রচিত বাৎসল্য রসের গল্পগুলি। সতীনাথ বহির্জীবনে বেশ অন্তর্মুখী বা Introvart হলেও অন্তর্জীবনে মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বড়ই মধুর ও ঘনিষ্ঠ। যদিও খুব অল্প বয়সেই মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় সেই স্নেহ ছায়া থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, তবুও সম্পূর্ণ জীবনে মায়ের ভূমিকা, মায়ের স্মৃতি কখনো মলিন হয়ে যায়নি। আর সেই প্রগাঢ় উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশেই গড়ে উঠেছে তাঁর 'ডাকাতের মা', 'ফেরবার পথ' কিংবা 'ধস'-এর মত গল্পগুলি। যেখানে ভিন্ন-ভিন্ন পরিস্থিতি-পরিবেশ নির্বিশেষে, এমনকি, মানুষ-পশু নির্বিশেষে মাতৃত্বের উজ্জ্বল রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কাহিনী বা জীবন চিত্রণের নিরিখে এই গল্পগুলি যেমন পাঠকের ভালো লাগাকে কেড়ে নিয়েছে, তেমনি ভাষার সুললিত ব্যবহারে উপস্থাপন কৌশলের স্বকীয়তায়, সামঞ্জস্যপূর্ণ সংলাপের সৃষ্টিতে, কাহিনী বর্ণনের রীতিতে এমনকি প্লটের ব্যবহারে বারংবার পাঠককে অভিভূত করে। চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করতে সঠিক স্থান-কাল-উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে গড়ে তুলে সতীনাথ যেভাবে গল্পের কাহিনী এবং মূল বক্তব্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা যথার্থ ভাবেই শিল্পরূপ সম্মত হয়েছে।

প্রথমেই আমরা সতীনাথের বাৎসল্য রসের ধারায় 'ডাকাতের মা' গল্পটিকে ধরে বাক্ নির্মিতির আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। জাত-পাত, ধনী-নির্ধন, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ নির্বিচারে যে মায়েদের স্নেহের-ভালোবাসার-মমত্বের কোন প্রভেদ হয় না, এই সত্যের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে 'ডাকাতের মা' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সৌখীর ডাকাত হয়ে ওঠার কাহিনী এবং তার মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক, পারস্পরিক ভালোবাসা, স্নেহ, কর্তব্য এইসব নিয়েই গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে। বৃত্তাকার প্লটের ব্যবহারে, বিবৃতিধর্মী উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে গল্পটির কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে। সন্তানের জন্য একজন মায়ের অসহায়তা, সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা-কর্তব্যের টানে মায়ের অসৎ পথে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে লেখক এই গল্পে পাঠককে এক নতুন ধারণা প্রদান করেছেন। গল্পটির কাহিনীর গড়ন ভীষণ ছিপছিপে ধরণের। অপ্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের বর্ণনা এ গল্পে একেবারেই নেই। লেখকের Emphasis পড়েছে সৌখীর ডাকাত হয়ে ওঠার কাহিনী, তার জন্য তার মায়ের গর্ববোধ, মায়ের মনে ছেলের প্রতি অগাধ ভালোবাসার বিষয়টুকুর ওপরেই। মা ও ছেলের মধ্যেকার নিদারুণ বোঝাপড়াকে লেখক

যেভাবে তুলে ধরেছেন তার সামান্য উদাহরণেই পাঠক গল্পটির অভিমুখ বুঝে নিতে পারবে — "... টক্‌টক্ করে দু টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হলে বুঝতে হবে দলের লোক টাকা দিতে এসেছে। তিনবারের পর আরও একবার হলে বুঝতে হবে যে, সৌখী নিজে বাড়ি ফিরল। ছেলের আবার কড়া হুকুম — 'তখনই দরজা খুলবি না হুট করে! খবরদার! দশবার নিঃশ্বাস ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করবি। তারপর দরজা খুলবি।'"[১২৭]

মা ও ছেলের মাঝখানে ছেলের বউ অর্থাৎ সৌখীর স্ত্রী যেন একটুখানি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। মায়ের কাছে ছেলের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। সৌখীর প্রতি তার মার অনুভূতি ও উপলব্ধি বোঝা যায় গল্পে বর্ণিত কথকের বর্ণনা থেকে — "ঘুম আর আসতে চায় না। রোজ রাতেই এই অবস্থা। মাথা পর্যন্ত কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে না নিলে তার কোন কালেই ঘুম হয়না শীতের দিনে। ... ঘুমের অসুবিধা হলেও, ছেলের কথা মনে করে সে একদিনের জন্যও নাক মুখ ঢেকে শোয়নি পাঁচ বছরের মধ্যে।"[১২৮] ডাকাতি করাটাই সৌখীর 'বেরাদারী' পেশা। তার পূর্বে তার বাবাও এই পেশাতেই নিযুক্ত ছিল। বাবা মারা যাবার পর সৌখী ডাকাতির পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর ডাকাতের মা হয়ে যে বুড়ি অর্থাৎ সৌখীর মা বেশ গর্বই বোধ করে তারও প্রমাণ মেলে এক টুকরো সংলাপের মধ্যে — "বুড়ি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে ... এ ছেলে বুড়ো হয়েও একই রকম থেকে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে; বুক ফুলিয়ে পাড়া জাগিয়ে ঢুকতে পারত বাড়িতে অনায়াসে। কিন্তু দরজায় টোকা মেরে মা'র সঙ্গে খুনসুড়ি হচ্ছিল এতক্ষণ। ... এ আনন্দ আর রাখবার জায়গা নেই।"[১২৯] উদ্ধৃত সংলাপ থেকেই পাঠক বুঝতে পারে যে সৌখীর মার তার ছেলে ডাকাত বলে কোন সংকোচ, কোন দ্বিধা বা লজ্জা নেই বরং নিজের ছেলের কাজে সে আর পাঁচটা ভদ্র সমাজের মায়েদের মতই গর্বিত বোধ করে।

তবে ছেলে যতই সাহসী হোক না কেন, ছেলের ডাকাতিতে যতই পারদর্শিতা থাক না কেন, জেলে যাবার পর পাঁচ বছর ধরে ছেলেকে না দেখতে পেয়ে সৌখীর বুড়ি মা'র মনের যে কষ্ট, ছেলের জন্য তার যে উৎকণ্ঠা — তা পৃথিবীর আর সব মায়েদের মতই ততটাই আন্তরিক ও অনুভূতি প্রবণ। তাই দেখা যায় দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে ছেলে মায়ের কাছে ফিরে এলে মা ছেলের মুখে তার ভালোবাসার একটু খাবার তুলে দেবার জন্য চুরির পথ বেছে নেয়। সৌখী এবং তার বাবা ডাকাত হলেও তারা কখনোই তার মাকে এ পথে নামতে দেয়নি। আর চুরি করাটা তাদের কাছে ছিল অসম্মানজনক। কিন্তু তবুও সবকিছু জেনে বুঝেই ছেলের মুখে একটু খাবার তুলে দেবার জন্য সৌখীর বুড়ি মা ভাবে — "... আলু চচ্চড়ি খেতে কী ভালই বাসে সৌখীটা! কতকাল হয়ত জেলে খেতে পায়নি। আলু, চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোরে উঠেই কি ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা যোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেব! ..."[১৩০] তাই ছেলের মুখে দুটি ভাত তুলে দিতে সৌখীর মা এই প্রথমবার চুরির পথ বেছে নেয়। সুতরাং এই গল্পের ক্লাইম্যাক্সকে সতীনাথ

যেভাবে সাজিয়েছেন তা অনুভূতিপ্রবণ পাঠকের মনে একটা করুণ রসের সৃষ্টি করে। গল্পের শেষে দেখা যায় সৌখী যখন তার মাকে চুরির দায় থেকে রক্ষা করতে নিজের মাথায় সেই দায় চাপিয়ে নিয়ে আবার জেলে চলে যায় — " মা তখনও মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উনোনে চড়ানো আলুর তরকারির পোড়া গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।"[১৩১] সৌখীর মার এই চোখের জল পাঠককেও অশ্রু সজল করে তোলে। মায়ের হৃদয় নিংড়ানো অনুশোচনা-হাহাকার সব মিলে মিশে পাঠকের মনেও সমবেদনার সৃষ্টি করে।

'ডাকাতের মা' গল্পে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল গল্পটির শব্দ প্রয়োগ তথা সম্বোধন। সৌখী যে সমাজের, যে শ্রেণীতে অবস্থান করে সেখানে সে যখন তার মাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে তখন তা বেমানান হয় না। ফলত এ গল্পের সব সংলাপগুলিই সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী সাবলীল হয়ে উঠেছে। সৌখী এবং তার মায়ের পারস্পরিক সংলাপ শুনে কোথাও মনে হয় না যে তা আরোপিত। প্রতিটি সংলাপই একেবারেই চরিত্রানুগ হয়েছে। অশিক্ষিত পরিবারের একজন মানুষের মুখে যে ধরণের সংলাপ মানায় সতীনাথ তাই বসিয়েছেন সৌখী এবং তার মায়ের মুখে। এভাবেই 'ডাকাতের মা' গল্পে একেবারে সূচাগ্রের মত তীক্ষ্ণ-সংহত সংলাপের ব্যবহারেই, মেদহীন নির্ঝর ভাষায় অভিপ্রেত বিষয়ের সঠিক রূপ দানের মধ্য দিয়ে গল্পটির বাক্ নির্মিতি সার্থক হয়ে উঠেছে।

মাতৃত্বের আরেক রূপের নিদর্শন পাওয়া যায় বিদেশের পটভূমিকায় লেখা 'ফেরবার পথ' গল্পটিতে (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। উত্তমপুরুষে বর্ণিত এ গল্পটিতে কথকের জবানীতে সতীনাথ পাঠককে জানিয়েছেন যে সন্তানের সঙ্গে মায়ের নাড়ির টান দেশ-কাল-পরিস্থিতি ভেদের নিরিখেও একই রকম খাঁটি হয়। দেশ-কাল নির্বিশেষে পৃথিবীর সব মায়েদের মাতৃত্বেরই আলাদা কোন ধরন বা রকম নেই। সন্তানের থেকে শতশত হস্ত দূরে থেকেও সন্তানের জন্য মাতৃ হৃদয় সর্বদাই একই রকম ব্যকুল হয়ে ওঠে। এ গল্পটিতে সামান্য দু-একটি ঘটনা ধারার মধ্য দিয়েই সতীনাথ এই চরম সত্যকে উপস্থাপিত করেছেন। 'ফেরবার পথ' গল্পটির পট-পরিবেশ একটু ভিন্ন ধর্মী। গল্প কথকের জবানী থেকেই পাঠক জানতে পারে পুরো গল্পটি লণ্ডন থেকে ভারতবর্ষগামী একটি জাহাজের দুই যাত্রীকে কেন্দ্র করেই ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। গল্পের প্লট সরলরৈখিক, জাহাজের দুই যাত্রী যারা প্রকৃত পক্ষে মা ও ছেলে, তাদের বিভিন্ন আচার-আচরণ, কথোপকথন, সম্পর্কের টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয়েছে গল্পের প্লট। গল্পটির কথন ভঙ্গি ঠিক জটিল-বিবৃতিমূলক নয় — কথক নিজেও জাহাজের একজন যাত্রী। তাঁর যাত্রাপথের অভিজ্ঞতার নানা সরস গল্প, নানা ঘটনাই তিনি পাঠককে যেন বলে চলেছেন গল্প বলার ঢঙে। আর কথকের মুখে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে তাদের যাত্রা পথের জাহাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা — ৩১৫ নম্বর বার্থের রাজকুমারী এস. দেবী এবং ৩১৩ নম্বর বার্থের মিস্টার এস. সিং-এর কথা।

'ফেরবার পথ' গল্পটির কথনভঙ্গিতে পাঠকও কথকের মতই প্রথম দিকে মিস্টার এস. সিং এবং রাজকুমারী এস. দেবীর আসল সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারে না। বরং পাঠক এই বিশ্বাসের সঙ্গে গল্পটি পাঠ করতে থাকে যে রাজকুমারী এস. দেবী এবং মিস্টার এস. সিং-এর মধ্যে কোন প্রণয় সম্পর্ক ছিল, যা বর্তমানে কোন কারণে তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। পাঠকের এই ধারণার মূলে রয়েছে কথক বর্ণিত জাহাজের নানা গসিপের কথা। যেমন জাহাজের 'স্টুয়ার্ডেস'-এর মুখ থেকে কথক সহ অন্যান্য যাত্রীরা রাজকুমারী সম্পর্কে জানতে পারেন যে — "তিনি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোন; তাই প্রাতঃরাশের টেবিলে যান না; সকালে স্টুয়ার্ডেস তাঁর টেবিলে কফি দিয়ে আসে; প্রচুর বকশিশ তিনি দেন স্টুয়ার্ডেসকে; আলাপ পরিচয় একরকম করেন না বললেই হয়; সাহেব ছাড়া আর কারো সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখা যায়নি; ... রাতে যতক্ষণ 'বার' বন্ধ না হয় ততক্ষণ তিনি কোণার দিকে একটা টেবিলে বসে 'সাদা ঘোড়া' মার্কা হুইস্কি খান।"[১৩২] রাজকুমারী এস. দেবী এবং মিস্টার এস. সিংকে নিয়ে গসিপের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাঠক জানতে পারে — "ডেকে, লাউঞ্জে, বারে যেখানেই ৩১৫ নম্বর কিংবা ৩১৩ নম্বরকে দেখতে পাওয়া যায়, তার কাছাকাছি গলা খাঁকার বা বেড়ালের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। পাত্র-পাত্রীকে শুনিয়ে টীকা-টিপ্পনীর অন্ত নেই।"[১৩৩]

কথক এবং পাঠক উভয়ের কাছেই সব চিত্র পরিষ্কার হয়ে যায় গল্পের একদম শেষে পৌঁছে — যখন জানতে পারে ৩১৩ নম্বর আর ৩১৫ নম্বরের যাত্রীদ্বয় কোন প্রণয়-প্রণয়ী নয় — তারা সম্পর্কে মা ও ছেলে। এছাড়া পাঠক এও জানতে পারে অনেক বছর আগে মায়ের একটা স্ক্যাণ্ডালের জন্য মাও ছেলের বিচ্ছেদ ঘটেছিল — আজও তার রেশ কাটেনি, মা সর্বান্ত ভাবে ছেলেকে ভালোবাসলেও এবং ছেলের মনেও মায়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলেও, অভিমানও কম নেই। তাই ছেলে তার মাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না — বারবার মায়ের আহ্বানকে প্রত্যাখান করে মাকে কষ্ট দেয় এবং নিজেও যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়।

সতীনাথ এই বিদেশিনী রাজকুমারী এবং তার ছেলের মধ্যেকার চাপা ক্ষোভ-অভিমান আর একরাশ কষ্টকে স্পষ্ট করেছেন সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকে। পাঠককে পূর্বাপর অজ্ঞাত রেখে একদম অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গল্প কথকের মাধ্যমে লেখক আসল সত্য উদ্ঘাটন করে দেন। যেখানে পাঠককে আবার ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়ে মা ও ছেলের প্রকৃত সম্পর্ককে বুঝে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে করুণ রসের আবহে গল্পকার গল্পের ইতি টেনেছেন।

যদিও 'ফেরবার পথ' গল্পটি পড়তে পড়তে কোথাও যেন মনে হয় জাহাজের যাত্রা পথে রাজকুমারী ও তার ছেলেকে নিয়ে লেখক পাঠককে সাসপেন্সে রেখেছেন। পাঠকের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় — তা গল্পটির কাহিনীকে একটু ভারাক্রান্ত করেছে ঠিকই। তবে একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায় — সম্পূর্ণ বিপরীত একটা ধারণা থেকে যখন পাঠকের সামনে আসল সত্যিটা উন্মোচিত

হয়, তখন পাঠকের চোখে চরিত্র দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সহানুভূতি সম্পন্ন পাঠকের অশ্রুসজল ভারাক্রান্ত মনেও পিথৌরার রাজকুমারীর গৌরবের থেকেও তার মাতৃত্বের রূপটি বহু গুণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মাতৃত্বের আরেকটি উজ্জ্বল রূপের নিদর্শন রয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ধস' (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) নামক গল্পটিতে। তবে এখানে মাতৃত্বের দুটি বিপরীত রূপকে সতীনাথ তুলে ধরেছেন দুই বিপরীত প্রাণীর মধ্য দিয়ে — যার একজন মানবী আর একজন চতুষ্পদ প্রাণী। এখানে যার মাতৃত্বের বোধে, দায়িত্ব জ্ঞানে এবং সর্বোপরি সন্তানকে রক্ষা করার অপ্রতিরোধ্য মানসিকতার প্রতিফলনে গল্পটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে — সে কোন মানবী নয়, একটি মানবেতর প্রাণী। মানব ও মানবেতর প্রাণীর মাতৃত্বের দুই ভিন্ন রূপের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'ধস' গল্পটি। একদিকে মনচনিয়া ও তার সতেরো দিন বয়সী সন্তানের অনভিপ্রেত মৃত্যু, আর অন্যদিকে মানবেতর প্রাণী একটি চতুষ্পদ সারমেয় কারিয়ার যৌবনেও মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ওঠা এবং ছোট্ট সারমেয় শাবক 'বাচ্চা'-কে রক্ষা করার দুই বিপরীত ধর্মী ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে। গল্প কথকের জবানীতে অর্থাৎ প্রথম পুরুষে বর্ণিত গল্পটির রচনা রীতি সতীনাথের অধিকাংশ গল্পের মতই বর্ণনামূলক।

বিয়ের দীর্ঘ দশ বছর পর মা হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারিণী মনচনিয়ার মাতৃত্বের সুখ তার ছেলের জন্মের সতেরো দিনের মধ্যেই কীভাবে ঘুঁচে যায় তার বর্ণনায়, ভাষার প্রয়োগে, শব্দের বাঁধুনিতে যেভাবে পরিস্থিতিকে গভীর বেদনা সঞ্জাত করে তুলেছে তাতে পাঠক মাত্রই মর্মযন্ত্রণা উপলব্ধি করে। মনচনিয়ার সতেরো দিনের ছেলে অপ্রত্যাশিত ভাবে মারা যাওয়াকে সতীনাথ যে শব্দবন্ধে, যে বাক্যে রূপ দিয়েছেন তা সত্যিই যেকোন পাঠককে শিহরিত করে তোলে — "... তারপর বুধে বুধে চৌদ্দ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি — এ সতর দিন তো হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। সতর দিন পরে যার জিনিস তিনি টেনে নিলেন কাছে। ... কত রকমে যায় কত লোকের ছেলে! ... গুড়ের নাগরির মধ্যে ডুবে ছেলে যেতে শুনেছে; গরম দুধের কড়ার মধ্যে পড়ে ছেলে যেতে দেখেছে। ... কিন্তু এরকম ভাবে যাওয়া! ... আহা রে! ওই তো একরত্তি রক্তের দলা! ... একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল। ... চাটছিল বুঝি। ... ভয় পেতে শিখবার আগে, বিপদ কি জানবার আগে। মায়ের বুকে ধস নেমেছিল হঠাৎ। ... জগদ্দল ননীর তালের নীচে বুক চাঁপা আঁধার। সে আঁধারের মধ্য দিয়ে শেষ কান্নাটুকুও বার হতে পায়নি! ..."[১৩৪] মনচনিয়ার মাতৃ হৃদয়ের হাহাকারকে স্পষ্ট করতে লেখক অতিরিক্ত কোন শব্দের ব্যবহার করেননি। মাত্র প্রাসঙ্গিক কয়েকটি শব্দের আঁচড়েই দক্ষ শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন কোন সন্তানহারা মায়ের ভাষা হীন আকুলতাকে — "সতর দিনের মাংসপিণ্ডটাকে বুকের জাঁতায় চটকে পিষে ফেলতে আর ভয় নেই মনচনিয়ার। চোখের জলে ওই বুকই ভাসে।"[১৩৫]

যেকোন সদ্যজাত শিশুর কাছে জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন তার মা এবং মাতৃ দুগ্ধ।

কিন্তু সেই মাতৃ দুগ্ধাধারই যে কোন মায়ের কোল থেকে সন্তানকে কেড়ে নিতে পারে সতীনাথের কলমে পাঠক বোধহয় এই প্রথম এই করুণ ঘটনার সাক্ষী হতে পারে। যে ভাষায় সতীনাথ মনচনিয়ার সদ্যজাত সন্তানের চলে যাওয়াকে বর্ণনা করেছেন তা পড়তে পড়তে পাঠক শিউরে ওঠে, তার গায়ে যেন কাঁটা দেয়। লেখকের দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে পাঠকও যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে 'আহা রে!'। পাঠক এক যন্ত্রণা কাতর সন্তান হারা মায়ের বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

এরপর 'ধস' গল্পে দ্বিতীয় ভাগে দেখা যায় সন্তান হারা মনচনিয়া ছোট্ট সারমেয় শাবক 'বাচ্চা'কে নিয়ে যখন নিজের গভীরতর শোক ভুলে থাকার চেষ্টা ক'রে 'বাচ্চা'কে বুকে টেনে নেয়, নিজের স্তন্যদানে ছোট্ট 'বাচ্চা'কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে — তখন তাকে বাধা দেয় তারই ছেলেবেলার পোষা কুকুর কারিয়া। বৃদ্ধা কারিয়া 'বাচ্চা'কে কিছুতেই মনচনিয়ার কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কারিয়া কীভাবে নিজের মাতৃত্বের স্নেহ-অধিকার বোধ দিয়ে পুত্র হন্তা মনচনিয়ার কাছ থেকে নিজের সন্তানসম বাচ্চাকে রক্ষা করে তার বর্ণনাও পাঠককে বিস্মিত করে — "ভোরে উঠে কারিয়া আর বাচ্চাটাকে উঠোনে দেখতে পাওয়া গেল না। যাবে কোথায়। ... দেখা গেল সেই হাঁসের ঘরে কারিয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়ে রয়েছে। ... মাথা নিচু করে দেখতে গেল মনচনিয়া। ... ঘ-র্-র্-র্-র্। ... এখানে আবার কিসের দরকার? ... ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে মুখ বার করে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে কারিয়া। দাঁত বার করে যেন কামড়াতে আসছে। ... হাত বাড়াতেই খেপে বেরিয়ে এল কারিয়া। চেনা কারিয়া নয়; এ একেবারে অন্য মূর্তি। ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝবার আগেই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। আঁচড়ে, কামড়ে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায় মনচনিয়াকে। মনচনিয়া ছিটকে গিয়ে পড়েছে লাউগাছটার ওপর।"[১৩৬]

মনচনিয়া কারিয়ার এই আচরণে চমকে যায়। কারিয়াকে উদ্দেশ্য করে সে বলে 'নতুন ছেলে পেয়েছে সাত জন্মের ছেলে।' এই ছোট বাক্যটিতে মনচনিয়ার মনোকষ্ট, লজ্জা এবং একটা চাপা ঈর্ষাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে দেখা যায় কারিয়ার স্তন্যাধারে দুধ এসেছে। এবারে সে সত্যি সত্যি 'বাচ্চা'-র মা হয়ে উঠেছে। লেখক ইঙ্গিত সূচক ভাষার ব্যবহারে যেভাবে কারিয়ার মাতৃত্বকে প্রকাশ করেছেন তা পাঠকের মন ছুঁয়ে যায় — "... নূতন বাচ্চা হবার সব লক্ষণ তার দেহে আর হাবে ভাবে সুস্পষ্ট। ... ... দুধ এসেছে কারিয়ার বুকে! ওই গরম, ভিজে থলথলে মাংস পিণ্ডের ভার তার হাতের ওপর পড়েছিল যখন কুকুরটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ... হ্যাঁ ভিজে! সত্যিই ভিজে! দুধ গড়াচ্ছিল কারিয়ার বুক থেকে! ..."[১৩৭]

এই গল্পের সংলাপ রচনায় একটা নতুন বিষয় লক্ষণীয়। এখানে ঠিক কথকের স্বগতোক্তি নয় — কথকের নিজের সঙ্গে নিজের অন্তর আলাপের মধ্য দিয়েই গল্পে সংলাপ সেজে উঠেছে। শব্দের পর শব্দ বসিয়ে ছোট ছোট বাক্যে, নিতান্ত সাদামাটা আটপৌরে ভাষায় যে সংলাপ রচিত

হয়েছে তার ব্যঞ্জনা যেমন গভীর তেমনি হৃদয়স্পর্শী।

সতীনাথ সবচেয়ে বেশি দক্ষ ছিলেন মানুষের অন্তর্মন-মানসিকতার চিনতে-বুঝতে। মানুষের বাহ্যিক চেহারা আচার-আচরণের অন্তরালে যে বিচিত্রধর্মী মন লুকিয়ে থাকে সতীনাথের অন্তর্ভেদী দূরদৃষ্টি ঠিক চিনে নিত সেই গভীর অন্তরালে থাকা মানুষের মনকে। তাই তাঁর রচিত গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক গল্প রচিত হয়েছে — মানুষের জটিল-বিসর্পিল মানসিকতা-মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই। তাঁর রচিত মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলির কোনটিতে নারীর প্রেম মনস্তত্ত্বকে, কোনটিতে দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তরালে থাকা নারীর সন্দেহবাতিক মনকে, কোনটিতে আবার নারীর উপলব্ধিতে আবিষ্কৃত হয়েছে পুরুষ চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব, আবার কোথাও একজন ব্যক্তির কোন অভ্যাসের সঙ্গে কীভাবে তার মানসিকতার জটিলতা ধরা পড়ে প্রভৃতি নানাবিধ জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ধরা রয়েছে চরিত্র ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে। আর এই সকল জটিল মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলিতে কি ধরণের ভাষা প্রয়োগ হয়েছে, চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলতে যে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, সংলাপ রচনায় বাক্যের মধ্যে শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কীভাবে চরিত্রের স্বভাব-অভ্যাস-বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন, সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলির বাক্ নির্মিতি, শিল্প রূপের প্রয়োগের কলাকৌশলে কীভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে তা দেখে নেওয়া দরকার।

সতীনাথের মনস্তাত্ত্বিক গল্পের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'ভূত' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)। 'ভূত' সতীনাথের একটি অসাধারণ প্রেম মনস্তত্ত্বের গল্প। গল্পের নামটি শুনে পাঠক অনিবার্য ভাবেই প্রথমে ভেবে নেয় হয়ত অতিপ্রাকৃত রসের গল্প। কাহিনীর শুরুতেও একটু অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায়। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুরজকুঁয়রীকে ভূতে ধরেছে। তাই ভূত তাড়ানোর প্রাগৈতিহাসিক ব্যবস্থাকে একমাত্র অবলম্বন মনে করে সুরজকুঁয়রীর বাবা লালা ইন্দরপরসাদ রহুয়া থেকে ওঝার সর্দার কানোয়া মুসহরকে নিয়ে এসেছেন একমাত্র মেয়ের শরীর থেকে ভূতকে বিদায় করার জন্য। সতীনাথের অসাধারণ প্রয়োগশৈলীর ছাপ রয়েছে 'ভূত' গল্পের শুরুতেই। এমন চমকপ্রদ, এমন আর্কষণীয় ভাবে গল্পের শুরু করেছেন যে — পাঠকমাত্রই গল্পটি পড়ার শুরু থেকেই প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে পড়তে বাধ্য কীভাবে সূরজকুঁয়রীকে ভূতে ধরেছে। ওঝা কীভাবেই বা ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। গল্পের প্রথম থেকেই পাঠকের মনে কীভাবে একটা টান টান উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন সতীনাথ তা সামান্য উদাহরণেই স্পষ্ট হবে —

"ঝাড় ফুঁক অনেক হল। ওঝার সর্দার কানোয়া মুসহরকে আনানো হল রহুয়া থেকে। সে এসে দুদিন অনবরত ছিলিমের পর ছিলিম গাঁজা টানে, আর বাড়ির লোককে ফরমাশের পর ফরমাশে অতিষ্ঠ করে তোলে। সুরজকুঁয়রীর উপর যতক্ষণ না ভূতে আবার ভর করছে ততক্ষণ তার মন্ত্র-তন্ত্র আরম্ভ হবে না।"[১৩৮]

সতীনাথ কতখানি আধুনিক মনস্ক ছিলেন উপরের উদাহরণ থেকে সেই বিষয়টিরও ইঙ্গিত

পাওয়া যায়। এমন ভাবে গল্পের সংলাপ রচনা করেছেন যেখানে ভূত ধরা বা ওঝা দিয়ে ভূত তাড়ানো এই বিষয়গুলি তাঁর কাছে কোনো ভাবেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না, সেটা বোঝা যায় ওঝা সম্পর্কে বলার সময়। 'ভূত' গল্পে গল্পবলার কৌশলটি চমৎকার। একটা রহস্য, কৌতূহল দিয়ে গল্পের শুরু করে ধীরে ধীরে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ও গল্পের সমাপ্তিতে পৌঁছে Anti Climax -এর মধ্য দিয়ে পাঠকের কৌতূহল নিরসন করেছেন, গল্পের রহস্য উন্মোচন করেছেন। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ গল্প জুড়ে নিজের আধুনিক মনস্কতা, বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয়ও দিয়েছেন। তাই দেখা যায় সুরজকুঁয়রীর ভূত তাড়ানোর জন্য হিন্দু-মুসলিম-বিহারী সব রকমের ওঝা এনেও কোন ফল হয় না। কানোয়া ওঝা যখন বলে, 'চামেলীর তেলের গন্ধ পাচ্ছি; সৌখীন মুসলমান ভূত।' তখন ঠিক হয় মুসলমান ভূতের জন্য মুসলমান ওঝা ডাকতে হবে। আর তার পরেই সময় নষ্ট না করে নিয়ে আসা হয় মুসলমান রুস্তম ওঝাকে। ওঝা বাড়িতে ঢুকেই বলে, 'চেনা-চেনাই তো ঠেকছে জিনের চেহারাটা।' তারপর তার বিধান অনুযায়ী পরের দিন বাড়ির সীমানার ওপর একটা কালো মুরগী জবাই করে আর মন্ত্রপূত সরষে পুড়িয়ে বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে নিজের দক্ষিণা নিয়ে যেতে যেতে বলে, 'এখন দেখুন আপনার কপাল, মন্তরের তাকৎ, আর আমার হাতযশ।' ওঝার এই কথা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় — এসব ঝাড়ফুক তুক্‌তাক্ আসলে বুজরুকি-ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়।

সতীনাথ সেই সময়ে মানুষের মধ্যে অশিক্ষাজনিত অন্ধবিশ্বাস, নানা কুসংস্কারকে তুলে ধরেছেন সুরজকুঁয়রীকে ভূতে ধরা ও ওঝা দিয়ে তার চিকিৎসা করানো বিষয়টির মধ্য দিয়ে। তারপর যখন ভ্রান্ত বিশ্বাস আর কুসংস্কারের বশে নিজের সন্তানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে তখন আর উপায়ান্তর না দেখে সুরজকুঁয়রীর বাড়ির লোকের রায় হয় ডাক্তার ডাকার। তাও দেখা যায় প্রথমেই সরাসরি ডাক্তার নয় — ডেকে আনা হয় নিবারণ ডাক্তারের কমপাউণ্ডার হরিশবাবুকে, তাদের কথায় 'হরিশ ডাক্তার'কে। গলার স্টেথিস্‌কোপ ঝুলিয়ে সাইকেল নিয়ে হরিশডাক্তার আসে সুরজকুঁয়রীকে দেখতে। সুরজকুঁয়রীর মার মুখ থেকে দরজার আড়াল থেকে ইনিয়ে-বিনিয়ে মেয়ের ভূতে পাওয়ার গল্প শুনে তারপর শিশির ওষুধ দিয়ে চলে যান। অনেকদিন চলে হরিশ ডাক্তারের ওষুধ। তারপর কোন পরিবর্তন না দেখে হরিশ ডাক্তার সুরজকুঁয়রীর বাবাকে প্রকৃত ডাক্তার ডাকার কথা বললে শেষ পর্যন্ত আসে আসল ডাক্তার নিবারণ বাবু। তিনি রোগীকে দেখে তার রোগের বৃত্তান্ত শুনে কোন প্রেসক্রিপশন লেখেন না। ঘরের বাইরে এসে ভিজিটের টাকা পকেটে গুঁজতে গুঁজতে বলেন — "কোনো ওষুধের দরকার নেই। বিয়ে দিয়ে দেন তাড়াতাড়ি। ছেলে পিলে হলেই সেরে যাবে। দুধ খেতে দেবেন।"[১৩৯] কিন্তু ডিসপেনসারীতে ফিরে গিয়ে কমপাউন্ডার বাবুকে জানান 'হিস্টিরিয়াকেস'।

ছোট ছোট সংলাপের মধ্যে দিয়ে সতীনাথ অনেক বৃহত্তর বিষয়কে তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। প্রতিটি চরিত্রের মুখে মানানসই সংলাপ দিয়ে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। যেমন — ইন্দরপরসাদ সম্পর্কে যখন বলেন — "তিনি নামে উকিলের মুহুরী, আসলে করেন মোকদ্দমার দালালি। মেয়ের অসুখের দৌলতে ফৌজদারী চারশ ছত্রিশ ধারার শাঁসালো দায়রা কেসটা বেহাত হয়ে গেল। ধরহরা থানার সব মোকদ্দমা তাঁর একচেটে। একবার একখানা গাঁয়ের পাঁচটি মক্কেল হাতছাড়া হওয়ার মানে চিরকালের জন্য গোটা গাঁখানা হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা; কেন না কোনো হাকিমের সাধ্যি নেই এ মোকদ্দমার আসামীদের বাঁধে।"[১৪০] ইন্দর পরসাদের কথাগুলো থেকে তার চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি মুহুরী, উকিল নন, তাই নির্দিষ্ট রোজগারের অঙ্ক তার নেই। যত শ্রম তত অর্থ — অর্থাৎ আদালতে গিয়ে মামলা ধরে আনতে পারলেই তার রোজগার। কাজেই বাড়িতে বসে থাকলেই তার রোজগারের ক্ষতি। কিন্তু একমাত্র সন্তানের অসুখে বাবা হিসেবে তার পাশে থাকাটাও তার কর্তব্য, বিশেষ করে যখন চিকিৎসা চলছে। তাই একদিকে নিজের রোজগার যার ওপর তার সংসার স্ত্রী-কন্যা বেঁচে আছে, আর একদিকে তার মেয়ের অসুখ এই দুই-এর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত একটি চরিত্র ইন্দরপরসাদ। তার এই চরিত্রটি খুবই বাস্তব ও জীবন্ত।

আবার ইন্দরপরসাদের এক বিধবা দিদির চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে তার মুখে সতীনাথ যে সংলাপ প্রয়োগ করেছেন তাও যতটা জীবন্ত, ততটাই চরিত্রানুগ। যেমন — একমাত্র ভাইজিকে যখন ভূতে পেয়েছে, সে যখন বার বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, তখন পিসিমার কষ্ট মিশ্রিত রাগ-ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ খুবই বাস্তব ও সংগত — "—পিসিমা সকাল সন্ধ্যা টিকটিক করেন। আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়ে; দিনরাত এ বাড়ি ও বাড়ি পাড়া বেড়ানো; একবার বাড়ির বার হলে আহার নিদ্রার খেয়াল থাকে না তার। সোমত্ত মেয়ে। তোদের বয়সে আমরা তিন ছেলের মা। যাক্‌গে মরুকগে — যাদের মেয়ে তারা যা ভাল বোঝে করুকগে যাক। তবে এতটা নাই দেওয়া ভাল নয়। আজকালকার যুগই আলাদা। কে কার কথায় কান দেয়? আর মেয়ের মা বাবাই যদি না শুনলে তবে আর মেয়েকে বকেই বা কি, ঝকেই বা কি।"[১৪১] পিসিমার মুখের এই সংলাপ একেবারে জীবন্ত। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে — একজন বিধবা-নিরক্ষরা মহিলার পক্ষে এর থেকে অন্যকিছু ভাবা বোধহয় সম্ভবপর ছিল না। শুধু পিসিমা নয়, লেখকও প্রত্যেকটি চরিত্রকেই সময়োপযোগী জীবন্ত-বাস্তব রূপ দান করেছেন তাদের মুখের ভাষা তাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে।

এই গল্পেও সতীনাথের উপমার ব্যবহার লক্ষণীয়। ইন্দরপরসার তার অসুস্থ মেয়ের পাত্র খুঁজতে গিয়ে আজোকোপ্পা গ্রামের 'কিষণপচ্ছী' কায়স্থ বংশের ছেলে গজাধরকে নিজের জামাতা হিসেবে নির্বাচন করে। বংশমর্যাদায় গজাধররা তাদের থেকে নিম্ন বংশের। কিন্তু মেয়ের রোগের কারণে নিজেদের জাতবেরাদারের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্কও করতে পারে না, তাই সব দিক চিন্তা করে

গজাধরের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে ঠিক করে। গজাধরের বাড়ির লোক উচ্চবংশের মেয়ে পেয়ে পাত্রী সম্পর্কে কোনপ্রকার খোঁজ খবর না নিয়েই তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে ঠিক করে ফেলে। এই প্রসঙ্গেই সতীনাথ যে উপমাটির প্রয়োগ করেছেন তা যেমন অভিনব তেমনি প্রাসঙ্গিক — "দুইপক্ষই লাভে আছে — দোকানদার চালাচ্ছে বস্তা পচামাল, আর খদ্দের দিচ্ছে অচল টাকা।"[১৪২] গজাধরের সঙ্গে বিয়ের পর বাপ-মায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে সুরজকুঁয়রী কাঁদতে কাঁদতে পাড়া মাথায় করে বরের সঙ্গে গরুর গাড়িতে করে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। তারপর শুরু হয় তার নতুন জীবন। সুরজকুঁয়রীর এই নতুন জীবনের যে কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন সতীনাথ তা পাঠককে মুগ্ধ করে — "মধুর আলোয় রঙিন হয়ে ওঠে তার জগৎ। কোনো বিভীষিকার ছায়া নেই তাতে। নতুন নেশার মিঠে মাদকতায় ভরা একটা বছর প্রায় ঘুরে আসে। স্বপ্নের মতো মধুর মাস কয়টি কোথা দিয়ে কেটে যায় সুরজকুঁয়রী তা বুঝতেও পারে না।"[১৪৩] সেই মুসলমান ভূত এই একবছরে একবারও তার ওপর ভর করেনি। সুরজকুঁয়রী নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝে — তার স্বামী গজাধর কাছে থাকলেই ভূতটা পালাবে।

গল্পের একেবারে শেষে পৌঁছে লেখক সুরজকুঁয়রীর মুসলমান ভূতের রহস্য উদ্ঘাটন করেন Anti Climax -এর মাধ্যমে। এই মুসলমান ভূতটি আর কেউ নয় — সে স্বয়ং সুরজকুঁয়রীর স্বামী গজাধর। গজাধর এক সময় নোটঙ্কী করত। সেখানে 'সমরু' নামের পালার একটি চরিত্র রফিক। গজাধর বরাবর রফিকের চরিত্রে অভিনয় করত। একবছর পূর্বে চিত্রগুপ্তের পুজোর দিন গজাধর ও তার দল থিয়েটার করতে গিয়েছিল সুরজকুঁয়রীদের গ্রামে। সেখানেই সে সুরজকুঁয়রীকে দেখে পছন্দ করেছিল এবং পালার শেষে তার পিছু ধাওয়া করেছিল তার বাড়ি পর্যন্ত। তখন গজাধর ছিল রফিকের বেশে। আর রাতের অন্ধকারে তাকে দেখেই সুরজকুঁয়রী ভূত ভেবে ভয় পেয়েছিল। পরে যখন সুরজকুঁয়রীর সঙ্গেই গজাধরের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যায় তার বাবা ইন্দরপরসাদ, গজাধর এবং তার বাড়ির লোক সেই প্রস্তাব একেবারে লুফে নিয়েছিল। গজাধর প্রথম থেকেই সব জানলেও কোনদিন সুরজকুঁয়রীর কাছে সেই রহস্য উদ্ঘাটন করেনি। তাই লেখক যখন বলেন গজাধর সম্পর্কে সুরজকুঁয়রীর মনের উপলব্ধি — তার প্রাণ বাঁচাতে পারে কেবলমাত্র গজাধর — 'অথচ তার মনের এই গোপন কোণটির খবর তার স্বামী রাখে না।' কিন্তু একথা ঠিক নয়। গজাধর সব জেনে শুনেই স্ত্রীর কাছে সব কথা গোপন করে যায় এই ভেবে যে, সত্যিটা জানলে তার স্ত্রী যদি তাকে আর ভালো না বাসে। কিংবা হয়ত গজাধর তার প্রতি তার স্ত্রীর এই গভীর ভালোবাসার মুগ্ধতাকে সারাজীবন ধরে উপলব্ধি করতেই স্ত্রীর কাছে সব গোপন করে যেতে চায়। কিন্তু গল্পের একদম শেষে পৌঁছে লেখক পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে সুরজকুঁয়রীর কাছেও ভূতের আসল সত্যটা উদ্ঘাটন করেন। বিয়ের পরের বছর আবার চিত্রগুপ্তের পূজো উপলক্ষে সুরজকুঁয়রীর শ্বশুরবাড়ির পাশের গ্রামে বিরৌলী বাজারে মেলা বসেছে। সেখানেই থিয়েটারে অভিনয় করে সুরজকুঁয়রীর স্বামী গজাধর

তার সেই পুরোনো 'সমরু' পালায় 'রফিক' চরিত্রে। সেদিনও থিয়েটার দেখতে গিয়ে স্টেজের ওপরে 'রফিক' কে দেখে সুরজকুঁয়রীর পুরোনো ভয়ঙ্কর স্মৃতিটা জেগে ওঠে। আবার সে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। সুরজকুঁয়রীর এই অনুভূতির বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন —

"গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে রফিক। অজ্ঞাত কারণে একটু যেন শিউরে ওঠে সুরজকুঁয়রী। ... রফিকের পিঠের দিকটা কেবল দেখা যাচ্ছে; শিরোয়ানী আর চুস্ত পায়জামা পরনে। শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা ঝিমঝিমুনী ধীরে ধীরে সুরজকুঁয়রীর সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ... ঠিক জৌনপুরী গন্ধতেল-ওয়ালার মতো দেখতে। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার।"[১৪৪] সুরজকুঁয়রী ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। সে তার সঙ্গে যাওয়া ননদকেও কিছু বলতে পারে না। কারণ তারা তার বিয়ের পূর্বের ভূতে ধরার বিষয়টা জানে না। তাই একা একা ভয়ে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তার কেবল রফিককে দেখে মনে হয় — "... এইবার — এইবার সে এদিকে মুখ করে দাঁড়াচ্ছে। সেই কাঁচাপাকা দাড়ি; সেই চোখ মুখ, গালের আঁচিল, মাথার সম্মুখের দিকে টাক, সেই শয়তানির হাসি; ভুল হওয়ার কি জো আছে! ঐ — ঐ যে সে এগিয়ে আসছে আমার দিকে! শরীরের সব স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। চিৎকার করে ওঠে সুরজকুঁয়রী। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।"[১৪৫]

সুরজকুঁয়রীর ননদ রেশমী ভাবে যে, গরমে বোধহয় সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। কারণ সুরজকুঁয়রী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। তারপর বাড়ি পৌঁছে তার ননদ-শাশুড়ী মিলে তাকে ঘরে শুইয়ে দেয়। তার জ্ঞান ফিরে এলেও সে কেমন যেন ভুল বকতে থাকে — 'এখুনি আবার ফিরে আসবে।'; 'একে বারে পিষে ফেলবে বুঝি'। হঠাৎ স্বামীর গলার আওয়াজ শুনে সুরজকুঁয়রী যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়। তার মনে সাহস হয় — "আতঙ্কজনক জগতের রক্ষাকবচ এখন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। ... গজাধরের অপ্রশস্ত বুকের সঙ্গে আরও ঘেঁষে শোয় সে। এই নির্বিঘ্ন আশ্রয়ে এসে পৌঁছে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।"[১৪৬] কিন্তু সুরজকুঁয়রী রাতের অন্ধকারে তখন তার পাশে শুয়ে থাকা রক্ষাকবচ অর্থাৎ তার স্বামী গজাধরের মুখ দেখতে পায়নি। রাতের অন্ধকার কাটলে কি হবে? গজাধরের রং মাখা মুখ দেখে সে কি আবার ভয়ে শিউরে উঠবে? নাকি দিনের আলোয় তার এতদিনের রহস্যের-ভয়ের চির সমাধান হবে? এই প্রশ্নের সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েই লেখক গল্পের ইতি টেনেছেন। তবে পাঠক অবশ্যই অনুমান করে নিতে পারে যে — দিনের আলোতে সুরজকুঁয়রীর ভূতের ভয় চিরতরে চলে যাবে, কারণ সে গজাধরকে দেখে বুঝতে পারবে এতদিন যাকে ভূত ভেবে সে ভয় পেয়ে এসেছে সে আর কেউ নয়, তার স্বামী গজাধর।

সুতরাং এই গল্পে সতীনাথ যেভাবে একটি অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে গল্পের মধ্যে রহস্যকে ঘনিয়ে তুলে পাঠককে টানটান উত্তেজনা আর কৌতূহলের মধ্যে রেখে একটি প্রেমের কাহিনীকে উপস্থাপন করেছেন তা অতি চমৎকার। কাহিনীকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে

গিয়ে তারপর Climax আর Anti Climax-এর মধ্য দিয়ে যেভাবে সমাপ্তি টেনেছেন তা গল্পটিকে অনায়াসে প্রথম সারির ছোটগল্পের শ্রেণীতে পৌঁছে দেয়। আর তাছাড়া প্রতিটি পরিস্থিতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে সতীনাথ যে ভাষা-কথনরীতি শব্দ এবং চিহ্নের ব্যবহার করেছেন তা কাহিনীর বক্তব্য বিষয়কে খুব সহজে এবং সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। যেমন যাত্রা দেখতে গিয়ে 'রফিক' চরিত্রকে দেখে সুরজকুঁয়রীর মনে যখন আবার তার পুরোনো ভীতির সঞ্চার হয় তখন যে শব্দ প্রয়োগ করেছেন '...এইবার — এইবার', '—ঐ —ঐ যে সে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।' এখানে একই শব্দ বা একই বর্ণের দুবার করে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে চরিত্রটির মধ্যেকার ভয়টা কতটা গভীর ছিল তা বুঝিয়েছেন। 'ভূত' নামকরণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিত থাকলেও আসলে এটি একটি প্রেমের গল্প; আর সেই গল্প কাঠামো তৈরীতে লেখক সতীনাথের কৃতিত্ব কতখানি তা বিশ্লেষণেই ধরা পড়ে।

সতীনাথের আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'পরিচিতা'। এখানে তিনি একটি নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে, অকারণ সন্দেহ বাতিকতাকে তুলে ধরেছেন একটি দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। 'পরিচিতা' গল্পের মূল চরিত্র প্রশান্ত এবং তার স্ত্রী শৈল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে অবস্থান করেও যে সম্পর্কটা সুস্থ-স্বাভাবিক থাকার কথা, সেখানে শৈলর সন্দেহ বাতিক মন তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে, দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কীভাবে সঙ্কট তৈরী করে দিচ্ছে তাই এই গল্পের মুখ্য বিষয়বস্তু। এ গল্পে পরিচিতা হল একজন স্ত্রী। যে তার স্বামীর সব থেকে নিকট-ঘনিষ্ঠ-পরিচিত হয়েও নিজের মধ্যে কতখানি জীবনের অপরিচয়ের ভাবনা লুকিয়ে রেখেছে, — তারই একটা শিল্পরূপ সতীনাথ এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

আমরা বিষয়বস্তু অংশে এ গল্পের প্রশান্ত ও শৈলর দাম্পত্য সম্পর্ক, শৈলর সন্দেহ বাতিক মনের জন্য তাদের সম্পর্কের মধ্যে কীভাবে সূক্ষ্ম ফাটল তৈরী হয় তা আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে শৈলর সন্দেহ বাতিক রূপটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং স্ত্রী হয়েও স্বামীর প্রতি সন্দেহ বাতিক গ্রস্ততার কারণে তার সাংসারিক জীবনে সুস্থতা কীভাবে নষ্ট হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ককে কীভাবে বিষিয়ে তুলেছে — কোন সংলাপ বা বাক্যের মধ্য দিয়ে সতীনাথ এই বিষয়গুলিকে কেমন ভাবে রূপ দান করেছেন কিংবা শৈল চরিত্রের সন্দেহ বাতিকতাকে তুলে ধরতে তিনি কোন কৌশল ব্যবহার করেছেন তা দেখে নেবার চেষ্টা করব। এ গল্পে লেখকের প্রধান লক্ষ্য ছিল শৈলর চেনা ছবির অন্তরালে থাকা সন্দেহবাতিক মনের চিত্রটিকে স্পষ্ট করে তোলা। শৈলর সব সন্দেহবাতিকতা তার স্বামী প্রশান্তকে কেন্দ্র করে।

শৈল সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক প্রথমেই জানিয়ে দেন মাসের শেষ কয়টা দিন টানাটানির সংসারে বাড়ির গিন্নি শৈলর চেহারা, তার আচার-আচরণ যেন ঢোঁড়াসাপের মতো ফণাহীন, বিষহীন।

কিন্তু যেই মাসপয়লা স্বামীর মাইনের টাকাটা তার হাতে পড়ে, অমনি তার দাপট, তার গিন্নিপনা শুরু হয়ে যায়। শৈল সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও লেখক জানিয়ে দেন — তা হল তার চরিত্রের সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা। তবে এই স্বভাব অন্য কাউকে নিয়ে নয়, একমাত্র তার স্বামীকে নিয়ে। প্রশান্ত যে তার স্ত্রীর স্বভাবের এই দিকটা জানে না তা নয় — তবে এই সন্দেহের কারণ তার আজও অজানা। শৈলর মনের এই দিকটির কথা জানা যায় যে সংলাপগুলির মধ্য দিয়ে, তার উল্লেখেই পাঠকের কাছে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শৈল তার বাড়িতে বয়স্কা মহিলা ছাড়া কাজের ঝি রাখতে চায় না। অল্প বয়সের মহিলাকে সে বিশ্বাস করে না। এটাই তার চরিত্রের সন্দেহবাতিকের দিক। স্বামীকে সে কেন এভাবে সন্দেহ করে তা কোনো দিন প্রশান্তও তার কাছে জানতে চায়নি। কারণ সে জানে এই দিকটা নিয়ে কথা বলে কোনো সুরাহা হবে না। তাই পুরোনো বয়স্কা কাজের ঝি গুলটেনের মার মুখঝামটা গালমন্দ সহ্য করেও শৈল তাকেই বাড়ির 'ঠিকে ঝি'-র পদে বহাল রাখে। স্বামী প্রশান্ত রিফিউজি ক্যাম্পের একজন অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক চাঁপাকে গুলটেনের মার থেকে দুটাকা কম মাস মাইনেতে কাজ করতে রাজি করালেও শৈল তাকে কিছুতেই রাখতে সম্মত হয় না। প্রশান্ত ও শৈলর পারস্পরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে সতীনাথ এই বিষয়টিকে কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সামান্য উদ্ধৃতিতেই স্পষ্ট হবে —

"একখানা ময়লা নোট বদলে, রাগে গজগজ করতে করতে গুলটেনের মা চলে গেল। তার উপর প্রশান্ত চিরকালই বিরক্ত। সংসারের ব্যাপারে সে সাধারণত কথা বলতে চায় না। কিন্তু আজ মাস পয়লার মেজাজে সে বলেই ফেলল।

'ছাড়িয়ে দিলেই হয় এটাকে! আজকাল আবার লোকের অভাব! রেফিউজি ক্যাম্পের হাজারটা লোক ঘোরাঘুরি করছে কাজের খোঁজে। সেই, যে মেয়ে মানুষটা সেদিন তোমায় বাঁশের ধুচুনি তয়ের কথা শেখাচ্ছিল — সেটা তো ছ'-টাকাতেই কাজ করতে রাজী, বললে না?'

'কে চাঁপা? রেফিউজি ক্যাম্পের লোক কে কেমন — জানা নেই, শোনা নেই! গুলটেনের মা হাজার হলেও পুরোনো লোক! ওকে পুজোর কাপড় দেব না ছাই! ও ওরকম বলে!'

প্রশান্ত আর কথা বাড়াতে চায় না। স্ত্রীর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মনের এই দিকটার সঙ্গে সে অপরিচিত। বয়স্থা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কাউকে শৈল বাড়িতে ঝি হিসেবে রেখে স্বস্তি পায় না।"[১৪৭]

শৈলর মনের এই সন্দেহবাতিকতার দিকটিকে আরো স্পষ্ট করতে সতীনাথ অত্যন্ত কৌশলে অথচ স্বাভাবিক ভাবে ঝি চাঁপার কথার মধ্য দিয়েই বিষয়টিকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন — "চাঁপার কথার যা অল্প স্বল্প বোঝা গেল তার অর্থ দাঁড়ায় যে — বাবুর কাছ থেকেই সে ব্যাপারটার সুবিচার চায়। এই জন্যই সে অপেক্ষা করছে। ... ছ'টাকা মাইনের চাকরিতে মা তাকে বহাল করে তিন দিন পরে ছাড়িয়ে দিলেন! কোন অপরাধে তা সে জানে না। কাল সকালে সে শুধু মাকে বলেছিল যে তাঁর মতো

ঝি-চাকরের উপর দরদ আর কোনো বাড়িতে সে দেখেনি। এঁটো বাসনগুলোয় জল ঢেলে ভিজিয়ে রাখলে ঝি-চাকরের মাজতে কত সুবিধে, এ কথা কি সব বাড়িতে খেয়াল রাখে? সে শুধু দোষের মধ্যে বলেছিল — মা আপনি রোজ রাত্রে এঁটো বাসনগুলোয় জল দিয়ে রাখেন, — দিনের বেলায় রাখেন না কেন? রোদ্দুরে বাসনগুলো শুকিয়ে খরখরে হয়ে থাকে। মা শুধু জিজ্ঞাসা করলেন রাতে বাসনে জল দেওয়া থাকে না কি? তার পরেই চক্ষু রক্তবর্ণ। বললেন — আজ ওবেলা থেকে আর কাজ করতে হবে না;"[১৪৮] চাঁপার এই সংলাপ থেকেই প্রশান্তর মতই পাঠকও শৈলর মাত্রাতিরিক্ত সন্দেহবাতিকতাকে অনায়াসেই ধরে ফেলে।

শৈলর স্বামীর প্রতি যে সন্দেহবাতিকতা উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়, তা যে কতটা ভিত্তিহীন লেখক পাঠকের কাছে সেই বিষয়টিকে একটা ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। গল্পের চরিত্রকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রেখে একটা নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তবে এই নাটকীয় পরিবেশ গল্পে অবাঞ্ছিত নয় — অতিরিক্ত নয় বরং গল্পের কাহিনীকে পরিপূর্ণতা দান করতেই এর প্রয়োজন ছিল। আসলে এই গল্পটিতে লেখক বৃত্তাকার প্লটের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং পরিণতি দান করেছেন। গল্পটির কাহিনীকে লেখক এমন সহজ সরল ভাবে উপস্থাপন করেছেন যেখানে একটি সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সাংসারিক টানাপোড়েন, আর্থিক সংকট, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে শৈলর স্বামীর প্রতি সেই সন্দেহবাতিকতা, এসবই পাঠককে টানটান উত্তেজনায় বেঁধে রাখে। গল্পের বাক্‌রীতি — সংলাপ রচনার কৌশল পাঠককে কখনো ক্লান্ত করে না, বরং-গল্পটি পড়তে পড়তে অনেক পাঠকই হয়ত খুঁজে পেতে পারে তাদের নিজেদের জীবনের গল্প। যেমন সংলাপ রচনা ও চরিত্র সৃষ্টি ক্ষেত্রে এই গল্পে আরও যে কথাটি অবশ্যই বলতে হয় তা হল — বাড়ির ঠিকে ঝি গুলটেনের মা কিংবা চাঁপা চরিত্র নির্মাণে; তাদের সংলাপে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা খুবই বাস্তবসম্মত। গল্পের শুরুতেই প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেমন সুকৌশলে দুটো-একটা বাক্য ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করেছেন তেমনি গুলটেনের মার চরিত্র বর্ণনার মধ্যে দিয়েও একটা শ্রেণী চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

"ঠিকে ঝি গুলটেনের মা প্রতি মাসপয়লার অপেক্ষা করে বাবুর আপিস থেকে বাড়ি ফিরবার। সে এ পাড়ার ডাকসাইটে দজ্জাল ঝি! পোড়া-বাসন মাজবার সময় চিৎকার করে বে-আক্কেলে বাড়ির লোকদের গালাগালি না দিলে সে গতরে জোর পায় না।"[১৪৯]

আর যখন শৈল গুলটেনের মাকে ছাড়িয়ে পয়সা বাঁচাতে ছ'টাকা মাইনেতে রেফিউজি ক্যাম্পের চাঁপাকে রাখে তখন কাজটা চলে যাবার জন্য শোকে-দুঃখে, রাগে-ক্ষোভে চাঁপার উদ্দেশ্যে গালমন্দ ক'রে পাড়া মাথায় করে — "... ঐ বজ্জাত পাকিস্তানি মাগী, চাল নেই, চুলো নেই, কোথায় বাড়িঘর তার ঠিকানা নেই, এখানে এসে, লম্ফঝম্ফ গপ্‌পো ঝাড়ে, ওর নাকি তিনশ বিঘা ধানের ক্ষেত ছিল।

গভর্ণমেন্টকে ঠকিয়ে খাচ্ছে ওদিকে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে খোরাকি নিচ্ছে, আবার এদিকে বাবু ভাইদের বাড়িতে কাজ নিয়ে আমাদের দানাপানি বন্ধ করছে। আরও কত রকমে তোরা রোজগার করিস জানি না বুঝি? যার চোখ আছে সেই দেখছে। গা ফুটে কুষ্ঠ বেরুবে এই বলে রাখলাম!"[১৫০] গুলটেনের মার এই সংলাপ একেবারেই চরিত্রানুগ হয়েছে, তার শ্রেণীর চরিত্রকে পাঠক চিনে নিতে পারে এই সংলাপের মধ্য দিয়ে।

সামান্য সামান্য কথায়, ছোট ছোট সংলাপে অনেক বৃহত্তর বিষয়কে তুলে ধরার কৌশল রপ্ত ছিল সতীনাথের। তাই অযথা ভাষাকে ভারাক্রান্ত না করে, সংলাপকে অকারণ দীর্ঘ না করে কাটাকাটা কথায় প্রয়োজনীয় কথাটা পাঠককে জানিয়ে দিতে সতীনাথের কোন জুড়ি নেই। এই গল্পে মূল বিষয় শৈলর সন্দেহবাতিক রূপটিকে পাঠককে চিনিয়ে দিয়ে, তার সঙ্গে অনেক ছোট ছোট বিষয়কে, টুকরো টুকরো ঘটনাকে নিজের অভিনব কৌশলে তুলে ধরে সতীনাথ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্তিগত সৃজনকৌশল, উপস্থাপনা, কাহিনী বিন্যাস এবং সর্বোপরি চরিত্রগুলিকে বিশেষ পরিণতির লক্ষ্যে উপযুক্ত ভাবে গড়েপিটে নিয়ে সংযত-সংহত বন্ধনে পুরো কাহিনীকে আবদ্ধ করে, কাঙ্ক্ষিতরসের পরিবেশনে কাহিনীকে শিল্পরূপ দান করে তাকে পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন সতীনাথ। আর এখানেই 'পরিচিতা' — তার পরিচিত গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে, ব্যক্তিগত উপলব্ধির বাইরে বেরিয়ে একজন সাধারণ নারীর মনের কোণে জমে থাকা হীনমন্যতা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে নিয়ে হয়ে ওঠে সার্বজনীন-সর্বকালীন।

সতীনাথের মনস্তাত্ত্বিক গল্পের ধারায় শ্রেষ্ঠ গল্প 'বৈয়াকরণ' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। গল্পটির উপস্থাপন কাহিনীর অগ্রগতি ও সমাপ্তি পর্যন্ত মোটামুটি একমুখিনতার মধ্য দিয়েই বর্ণিত হয়েছে। গল্পের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে কথক ও কেন্দ্রিয় চরিত্রের মুখ দিয়ে। গল্পের প্রথম শুরুটা এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কেন্দ্রিয় চরিত্রের একটি বিশেষ মনোগত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, তাঁর স্বগত সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছে এবং সেই সংলাপটিতে চরিত্রটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত রয়েছে — "নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি — পূজা আহ্নিক করেন — শুদ্ধাচারে থাকেন — কুক্কুটাণ্ড দেখলে বমি ঠেলে আসে ... মিথিলা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনি; জেলা স্কুলে চাকরি থেকে পেনশন নেবার পর মেয়ে স্কুলে চাকরি নিয়েছেন।"[১৫১] যাঁর সম্পর্কে কথকের এই উক্তি তিনি এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সংস্কৃত পণ্ডিত তুরন্তলাল মিশ্র — যাঁকে সকলেই পণ্ডিতজী বলে চেনে। পণ্ডিতজী একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি। সবসময় নিজের চারপাশে একটা পরিখা তৈরী করে রেখে সতর্ক ভাবে চলাফেরা করেন। যাতে কোন অসংযমী মুহূর্তে তাঁর দ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি কিংবা কোন ত্রুটি না হয়ে যায়, যাতে তাঁর সম্পর্কে লোকের কোন ভ্রান্ত ধারণা না জন্মায় সে বিষয়ে সদা সতর্ক পণ্ডিতজী। এই গল্পটির প্লট রচিত হয়েছে পণ্ডিতজী চরিত্রটির নিজের সম্পর্কে দৃঢ় ধ্যান-ধারণা ভেঙে গিয়ে এক গভীর সত্য উপলব্ধিতে

পৌঁছনোর মধ্য দিয়ে। একজন পুরুষ তথা এই পণ্ডিতজীর আত্ম-উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কেমন করে পুরুষের মনে নারী সংক্রান্ত নানা জটিল মানসিকতা এবং পুরুষের বাইরের খোলসের অন্তরালে আসল চরিত্র-রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সতীনাথ তাই দেখিয়েছেন এই গল্পটির কাহিনী নির্মিতির মধ্য দিয়ে।

গল্পটি শুরু থেকে সতীনাথ মূল বিষয়টিকে কেন্দ্রিভূত করেছেন তুরন্তলালজী নামক চরিত্রটির ভাবনার মধ্য দিয়ে। নারীর চোখে ধরা পড়া পুরুষের আসল রূপ এবং পুরুষের নারী সম্পর্কে ধারণা এই দুই বিষয়ের সত্যতাকে যাচাই করতে তুরন্তলালজী নানা ভাবে নিজেকে, নিজের আচরণকে এবং তাঁর পরিচিত-আত্মীয় পুরুষদেরকে নিয়ে একটি বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তুরন্তলালজীর ভাবনার জগতে এই প্রশ্নের উদয় হয় যেভাবে তা গল্পের মধ্য দিয়ে সতীনাথ স্পষ্ট করেছেন — "আজ মাস দুয়েক থেকে পণ্ডিতজীর মনটা ভাল যাচ্ছে না। একটি মুমূর্ষু মহিলার মুখ থেকে নির্গত একটি বাক্য, তাঁর কর্ণগোচর হবার পর থেকে অষ্ট প্রহর তাঁকে পীড়া দিচ্ছে।"[১৫২] তুরন্তলালজীর শালাজ স্টোভের আগুনে পুড়ে যখন মৃত্যুর সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করছে তখন একদিন সে তাঁর ননদের অর্থাৎ পণ্ডিতজীর স্ত্রীর একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল '... ওরা কি ওই চায়!'। গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে একজন মৃত্যু পথযাত্রীর এই হৃদয় নিংড়ানো কথাটি পণ্ডিতজীকে, তাঁর পৌরুষত্বের অহংকারে তীক্ষ্ণ আঘাত হেনেছিল। তারপর থেকেই প্রতিনিয়ত পণ্ডিতজী নিজের ব্যাকরণের জ্ঞান, জগৎ-জীবনের নানা বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে 'ওরা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ খুঁজতে শুরু করেন। পণ্ডিতজীর এই অন্বেষণ তাঁর মনের এই প্রশ্নকে সতীনাথ গল্পটির মধ্যে যেভাবে যুক্ত করেছেন তার উল্লেখেই পাঠকের কাছে পণ্ডিতজী চরিত্রটির অনেক অজানা দিক স্পষ্ট হয়ে যায় — "আর সেই মুমূর্ষুর উক্তির যে শব্দটি দু-মাস থেকে তাঁর মনে কিরকির করে বিঁধছে, সেটা একটা সর্বনাম; তার উপর বহুবচন। দুটোর মধ্যে কোন মিল নেই, কোন সম্পর্ক নেই। শব্দটা হচ্ছে 'ওরা'। বাক্যটি হচ্ছে 'ওরা কি ওই চায়!' এই 'ওরা' শব্দটিকে নিয়েই যত গোলমাল।"[১৫৩]

শালাজের কথার সূত্র ধরে তুরন্তলালজী যেভাবে নিজেকে বিশ্লেষণ করেছেন তা পাঠককে আশ্চর্য করে। সতীনাথ এই গল্পে পণ্ডিতজী চরিত্রটিকে দুটো সত্তায় বিভক্ত করেছেন এবং এই দুটি সত্তার পৃথক পৃথক অনুধাবন-উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন ভাষার ঐশ্বর্যে। যেমন পণ্ডিতজী চরিত্রের একটি সত্তা, যে সত্তাটি তাঁর আরেকটি সত্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। মেয়েদের স্কুলে পড়াতে এসে নিজের সংকোচ-জড়তাগ্রস্ত আচরণে যখন পণ্ডিতজীর নিজের মনে প্রশ্ন জাগে — "মেয়েদের বেলা একরকম, ছেলেদের বেলা আর এক রকম হয়ে যান কেন তিনি?"[১৫৪] কিংবা যখন পণ্ডিতজী — "প্রশ্ন করলেন নিজেকে — পরস্ত্রীর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবার জন্য এত শুচিবাই কেন? ... কেন স্ত্রীলোকদের সম্মুখে সহজ ব্যবহার করতে পারেন না তিনি?"[১৫৫] পণ্ডিতজীর অন্তর্গত এই দুটি সংলাপ থেকেই পাঠক

আন্দাজ করে নিতে পারে পণ্ডিতজীর চরিত্রটির দ্বৈত সত্তাকে। যে সত্তার একদিকে তিনি নিজেকে 'সৎ', 'নিষ্কলঙ্ক', 'সংযমী' বলে মনে করেন, নিজের সম্পর্কে যেখানে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা — ''ব্যাকরণের বিধানগুলোর মতনই আষ্টে পৃষ্টে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ।''[১৫৬] এই পণ্ডিতজী আবার মনের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এবং নিজের শ্যালক ও নিজের সহকর্মী মৌলবী সাহেবের আচরণের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে — ''সবাই সমান ... তিনি, মৌলবী সাহেব, ছোট শালা, — সবাই!''[১৫৭]

পণ্ডিতজী চরিত্রটির পাশাপাশি সতীনাথ পণ্ডিতজীর শালাজের প্রতিবাদী মানসিকতাকেও এই গল্পে মাত্র কয়েকটি শব্দের সংহত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দৃঢ় ভাবে প্রকাশ করেছেন। অকারণ বাক্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেননি, মাত্র চারটি শব্দে নির্মিত অত্যন্ত ছোট অথচ একটি গূঢ় বাক্যের ব্যবহারেই সবটা পরিস্ফুট করেছেন — '... ওরা কি ওই চায়!'। এই ছোট্ট বাক্যটি পণ্ডিতজীর শালাজের মনের গভীর কষ্ট, ক্ষোভ এবং পুরুষ জাতি সম্পর্কে তাঁর বাস্তব উপলব্ধিকে সতীনাথ যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে গল্পটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। গল্পে তুরন্তলালজীর শালাজের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ শ্যালক যখন আবার মাত্র দু'মাস না যেতে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসবার জন্য তৈরী হয়ে যায় তখন তুরন্তলালজী তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে পারে মৃত্যুশয্যায় তাঁর শালাজের বলে যাওয়া কথা '... ওরা কি ওই চায়!'-র যথার্থতা।

'বৈয়াকরণ' গল্পের বাক্ নির্মিতিতে লেখকের ঘটনা বিন্যাসের দক্ষতা, পরিবেশকে বিশেষ ভাবে, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে তাকে ব্যবহার করা, গল্প শুরুর বিশেষ ভঙ্গি, বিশেষত পণ্ডিতজী চরিত্রটির দ্বৈত সত্তা, দ্বিধান্বিত চরিত্র যা পাঠকের কৌতূহলকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেয় এবং পাঠক দীর্ঘশ্বাসে এগিয়ে যেতে থাকে কাহিনীর ক্লাইম্যাক্সকে জানবার জন্য। পণ্ডিতজী চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে সঠিক ভাবে পৌঁছে দিতে তাঁর সংলাপে যেভাবে উপযুক্ত পরিস্থিতি ও পরিবেশে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন তাতে তাঁর ভাষা ব্যবহারের দক্ষতাই প্রমাণিত হয়। নিজের একাগ্র মননশীলতায় উপস্থাপন কৌশলের স্বকীয়তায় যেভাবে নারীর উপলব্ধিতে পুরুষের জটিল মনস্তত্ত্ব, পুরুষের নিজের উপলব্ধিতে সমগ্র পুরুষজাতির বিসর্পিল মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তা বারংবার পাঠককে অভিভূত করে এবং গল্পটি পড়তে উৎসাহী করে তোলে।

মনস্তাত্ত্বিক গল্পের ধারায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'পত্রলেখার বাবা' (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে কথকের মাধ্যমে, তবে এখানেও কথক গল্পের কোন চরিত্র নয়। সে কেবল গল্প কথক মাত্র — যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গল্পের সব পাত্র-পাত্রীর কার্যকলাপ এবং ঘটনার বর্ণনা করেছেন। গল্পটির উপস্থাপন পদ্ধতিতে কোনো নতুনত্ব নেই — তা বর্ণনামূলক। আর গল্পের প্লট

রচিত হয়েছে, কেন্দ্রিয় চরিত্র তথা দোলগোবিন্দবাবুর একটা চরিত্রগত অভ্যাস (বেনামী চিঠি পাঠানো) কীভাবে তাঁর নিজের জীবনে একদিন ডেসটিনির মতো সত্য হয়ে দেখা দেয়, তারই সহাস্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। সতীনাথ কী অপূর্ব কৌশলে দোলগোবিন্দবাবুর এই চারিত্রিক অভ্যাস বা হবির বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন তার সামান্য উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বেনামী চিঠি পাঠানো যে দোল গোবিন্দবাবুর ছেলেবেলার অভ্যাস এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অভ্যাস যে তাঁর ওপর নেশার মতো বুঁদ হয়ে চেপে বসেছে, তা বোঝাতে সতীনাথ অনেক কথা বলেন নি। সংহত ভাবে, অথচ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য করে যে ভাবে ভাষাকে ব্যবহার করেছেন, তাতে লেখকের মননশীলতা-গভীরতাই স্পষ্ট হয়েছে — "বেনামী চিঠি পাঠানো দোলগোবিন্দবাবুর পক্ষে নতুন না। এ তাঁর দীর্ঘ কালের অভ্যস্ত বিলাস। স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে কত বেনামী চিঠি যে তিনি আজ পর্যন্ত লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ... এই ঘন রসের নেশা তাঁর একদিনে গড়ে ওঠেনি। ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তিনি।"[১৫৮]

শুধু বেনামী চিঠি পাঠানোই নয়, দোলগোবিন্দবাবুর আরেকটি স্বভাব হল পরনিন্দা-পরকুৎসা করা এবং শোনা। আর তারপর সকলের অজান্তে রাতের বেলায় সেই সকল ঘটনাকে নিয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে বেনামী চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেওয়া এবং তা থেকে নিজের মনের কোনো এক গোপন রসনাকে তৃপ্ত করা। দোলগোবিন্দবাবুর চরিত্রের এই অস্বাভাবিকতার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে লেখক জানিয়েছেন — "তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তাঁর এ কাজ সমাজের কল্যাণার্থে। কিন্তু মনে মনে জানেন কেন লেখেন। এর মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত আনন্দ পান। দুর্বার এর আকর্ষণ।"[১৫৯]

তবে গল্পটির কাহিনী কথন বর্ণনামূলক হলেও, গল্পটিতে একটা বৈঠকী চালে-লঘুরসের সংযোজনেও কাহিনীর বেশ কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে দোলগোবিন্দবাবুর চারিত্রিক স্বভাব-বৈশিষ্ট্যও আরও বেশি স্পষ্ট ভাবে পাঠকের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। গল্পটির শুরুতেই রয়েছে একটা বৈঠকখানার আড্ডার চিত্র — যা দোলগোবিন্দবাবুর বৈঠকখানা বলেই পরিচিত। সেই বৈঠকখানার আড্ডার চিত্রকে তুলে ধরে সতীনাথ দোলগোবিন্দবাবু এবং তার বন্ধুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় দিতে চেয়েছেন। কাটা ছাঁটা শব্দে, ছোট ছোট বাক্যে বৈঠকখানার যে পরিচয় দিয়েছেন তার সামান্য উদ্ধৃতিতেই পাঠকের কাছে চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাবে — "দোলগোবিন্দবাবুর বাড়ির আড্ডায় চেঁচামেচি নেই, হৈ-চৈ নেই, কথা কাটাকাটি নেই। কথাবার্তাগুলো হয় থেমে থেমে। অতি সংক্ষেপে। একটু একজন বলে, বাকিটা সবাই বুঝে নেয়। ... যে রকম গল্পের সবটা করা যায়, সেসব গল্পে এ আসরের লোকের উৎসাহ নেই।"[১৬০]

এই গল্পে বেশ কিছু শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন — নেপাল > ন্যাপলা, কোন বিষয়ে

কোন চরিত্রের উৎকণ্ঠা বা বিস্ময় বোঝাতে ব্যবহৃত হয় — 'হ্যা-অ্যা' বা 'হ্যা-অ্যা-অ্যা'। সেই সঙ্গে গল্পে চরিত্রদের কথোপকথনকে যেভাবে চরিত্রের অঙ্গ ভঙ্গির সঙ্গে তুলে দিয়েছেন তাতে যেন মনে হয় পাঠক কোনো নাটককে মঞ্চে উপস্থাপন হতে দেখছে। যেমন — নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের বছর ঘোরার আগেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াকে কেন্দ্র করে দোলগোবিন্দবাবু এবং তার আড্ডার বন্ধুরা আকারে-ইঙ্গিতে কথোপকথনের মাধ্যমে যে বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছেন তার সামান্য সংলাপ তুলে ধরা হল — ' ''এই সেদিন বিয়ে হল না নীলমণিবাবুর মেয়ের?' একটু চাপা গলা মাধববাবুর। ... 'শ্রাবণ মাসে।' 'হ্যা-অ্যা'। 'আর আজকে হল এ মাসের তেইশে। 'হ্যা'। আঙুলের কড় গোনা শেষ হলে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, 'যাকগে যেতে দাও ওসব কথা।' ... 'শাঁসটুকু নিয়ে ছিবড়েটাকে যথা সময়ে বাদ দিয়ে দিতে তিনি জানেন।' ''[১৬১]

উদ্ধৃত ছোট্ট সংলাপটি থেকে যে কোনো পাঠক গল্পটির চরিত্রগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণায় পৌঁছাতে পারবে। সম্পূর্ণ গল্পটি জুড়ে এই রকম একটি দুটি শব্দের সংলাপ রয়েছে অনেক। যদিও গল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য দোলগোবিন্দবাবুর মতো একজন বিচিত্র তথা উদ্ভট মানসিকতার মানুষের উদ্ভট খেয়াল বা অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রকে চিনিয়ে দেওয়া। তবুও সেই বিষয়টির সঙ্গে সঙ্গে লেখক পুরো গল্পটির মধ্য দিয়েই আমাদের সমাজের বেশ কিছু মানুষ, যাঁরা বয়সে বৃদ্ধ হয়েও সমাজের জনরুচির বিপরীতে অবস্থান করেন — তাদেরও মুখোশ খুলে তাদের বিকৃত মনস্তত্ত্বের পরিচয়কেই স্পষ্ট করেছেন 'পত্রলেখার বাবা' গল্পে।

মানুষের মনের কোনো ভাবনা কিংবা কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো চাপা ক্ষোভ-রাগ যে কখনো কখনো মানুষের অবচেতন মনের সায় পেয়ে তার ইচ্ছে যেমন পূরণ করে, তেমনি আবার তাকে অপরাধীও করে তোলে — তারই করুণ মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'অভিজ্ঞতা' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)। 'অভিজ্ঞতা' গল্পটির প্লট নির্মিত হয়েছে ভোখরাহা গ্রামের একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এখানে গল্পকার জটিল প্লটের সাহায্যে কাহিনীকে সাজিয়ে তুলেছেন। গল্পের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে প্রথম পুরুষে কথকের মুখে, গল্পটির উপস্থাপন পদ্ধতি বর্ণনামূলক। গল্পটির মুখ্য চরিত্র ভোখরাহা গ্রামের থানার দারোগাবাবু শ্রী রামভরোসা প্রসাদ। একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামভরোসা দারোগার তদন্ত, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সবশেষে নিজের জীবনের একটি ব্যক্তিগত ঘটনাকে কেন্দ্র করে দারোগা মনের পরিবর্তন এবং খুনের কেসের ভিন্ন রিপোর্ট প্রদান ও আসামীর সাজা লাঘব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হওয়া প্রভৃতি ঘটনা ধারাকে যেভাবে সাজিয়েছেন, যেভাবে চরিত্রানুগ সংলাপ তৈরী করে কাহিনীর বাস্তবতাকে পরিস্ফুট করেছেন, ঘটনার বর্ণনায় পরিস্থিতি-প্রতিবেশের সামঞ্জস্য পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। একজন মায়ের সন্তান হারানোর বেদনা, ক্রন্দন এবং সন্তান হারিয়ে সর্বস্বান্ত-রিক্ত মা নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে, নিজের

প্রতিবাদী-তেজস্বিনী মাতৃসত্তাকে জাগিয়ে তুলে সন্তানের হয়ে স্বামী-সমাজের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে — তাই সতীনাথ মর্মস্পর্শী অথচ দৃঢ়, সংহত ভাষায় রূপদান করেছেন।

বিরসা মাঝির বউ নিজের তিন মাসের সন্তানের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে দায়ী করে সন্তানের বাবা অর্থাৎ তার নিজের স্বামীকে। কারণ বিরসার হাত থেকে ছুটে আসা কুড়ুলের আঘাতেই মৃত্যু হয়েছিল শিশুটির। এই অংশে সতীনাথ বিরসার স্ত্রী মুখে যে সংলাপ দিয়েছেন তা যতটা মাতৃ হৃদয়ের বেদনা-হাহাকার রূপ পেয়েছে ততটাই বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে — "বিরসা মাঝির বউ চিৎকার করে কেঁদে তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। 'ও দারোগা, দেখ্ একবার কী করেছে। তিন মাসের দুধের ছেলে! আহা রে! কুড়ুল দিয়ে থেঁতলে মাথাটা ভেঙে দিয়েছে। বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে কী মেরেছে দেখ্ জানোয়ারটা!' ... 'ও দারোগা, ঐ খুনেটাকে ধরে নিয়ে যা জেলখানায়। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দে।' "[১৬২] বিরসার বউ-এর এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে তার মাতৃ হৃদয়ের তীব্র বেদনা এবং স্বামীর ওপর ক্ষোভ-রাগ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বিরসার বউ-এর মাতৃসত্তাই বড় হয়েছে দেখা দিয়েছে। এই সংলাপ সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী হয়েছে। চরিত্রের জাতিগত অবস্থান-সামাজিক অবস্থাপ-শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী সংলাপ রচিত হয়েছে। অশিক্ষিত-নিরক্ষর বিরসার বউ যখন দারোগাবাবুকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে, কিংবা নিজের স্বামীকে 'জানোয়ার' বলে গালিগালাজ দেয় তখন তা এতটুকুও বেমানান মনে হয় না।

আবার বিরসা মাঝিও তার নিজের স্বপক্ষে দারোগার কাছে যে কথা বলে, তাতেও সেই চরিত্রটির সংলাপ পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত বলেই মনে হয়। বিরসার বউ-এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিরসা দারোগাবাবুকে বলে — "না না দারোগা, বিশ্বাস করিস না ওর কথা। আমি ছেলেটিকে মারিনি, অমন সুন্দর লেকে কি মারতে পারা যায়। ... ফাঁসিতে আমি ভয় পাইনে রে — বুঝলি। মারলে পরে আমি নিজেই স্বীকার করতাম দারোগার কাছে। ... ওই কুড়ুল দিয়েই যদি আমি ছেলেটাকে মারব, তবে ঘ্যাচ করে কোপ না বসিয়ে, ভোঁতা দিকটা দিয়ে মাথা থেঁতলে দেব কেন? আরে, ওই একরত্তি বাচ্চাকে মারতে আবার দা-কুড়ুল লাগে নাকি? পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে মরে যাবে, আঙুল দিয়ে টিপে দিলে মরে যাবে, কিন্তু তা কি পারা যায়? ইচ্ছা থাকলেও তা কি পারা যায়?"[১৬৩] বিরসা এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হয়েছে। বিরসা বদরাগী, মেজাজি হলেও সে যে অমানুষ নয় তা বোধহয় পাঠকও বুঝতে পারে। বিরসা দারোগাকে সত্যি কথাটা যখন জানায় যে — "কুড়ুল গিয়ে লেগে ছেলেটা মরেছে ঠিকই। সে কথা কি আমি অস্বীকার করছি? কিন্তু আমি মারিনি, আমার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে লেগেছে কুড়ুলটা আপনা থেকে। কাঁচা ছাল ছাড়ানো ময়না ডাল দিয়ে নতুন বাঁট লাগিয়ে ছিলাম কুড়ুলে। কাঠকাটবার সময় পিছলে বেরিয়ে গেল হাত থেকে। ছুটে গিয়ে লেগেছে একেবারে ওই কচি মাথাটায়।"[১৬৪]

তখন বিরসার কথা শুনে দারোগা সাহেবের যেমন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছিল সে বিরসা সত্যি কথাই বলছে, ওটা সত্যিই এক দুর্ঘটনা মাত্র, তেমনি পাঠকও বিরসার জন্য দারোগার সঙ্গেই বোধ হয় এক মত পোষন করবেন। কারণ বিরসার সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরী ভাবমূর্তির যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় — "বিরসা মাঝি একদৃষ্টে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে — বেদনাভরা তার করুণ চাউনি।"[১৬৫] এই বাক্যটি থেকেও মনে হয় সত্যি-সত্যিই বিরসা অপরাধী বা খুনী নয়। বিরসার আর একটি সংলাপ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যে সংলাপটি আরো দৃঢ় ভাবে পাঠকের মনে এবং দারোগার মনে এই ধারণা জন্মাতে সাহায্য করে যে বিরসা সত্যিই খুন করেনি ঐ ছোট্ট একরত্তি ছেলেটাকে — "সত্যি বলছি দারোগা, বিশ্বাস কর; ছেলেটাকে আমি মারিনি। আমার সে ইচ্ছা হয়নি একবারও তা নয়; মিছে বলব না তোর কাছে — ছেলেটাকে শেষ করে দেবার কথা আমি কালকেও ভেবেছি। আমার বাপ-ঠাকুরদার মুখে কালি দিচ্ছে ওই ছেলেটা। এ কথা আজ কাঠ কাটবার সময়েও ভাবছিলাম। ... এইসব কথা কুড়ুলটা হাত থেকে ফসকে যাবার আগের মুহূর্তেও ভাবছিলাম, কিন্তু আমি মারিনি। ... একেবারে বাচ্চা যে! ... ওকে কি মারতে পারা যায়! ... কিন্তু আমি না পারলে কী হবে! কুড়ুলটা শুনবে কেন? ওটা যে চলে আমার বাপ-ঠাকুরদার হুকুমে। আমার মনের চেয়েও এগিয়ে চলে।"[১৬৬] এই স্বীকারোক্তিকে মিথ্যে নয় বলেই শেষ পর্যন্ত রায় দেয় দারোগাবাবু। কারণ গল্পের শেষে পৌঁছে দারোগাবাবু সঙ্গে ঘটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে সত্যিই বিরসা মাঝি খুন করেনি — তার মনের একান্ত ইচ্ছা হলেও , ওটা সত্যিই দুর্ঘটনা ছাড়া আর অন্য কিছু ছিল না।

এই ভাবেই সতীনাথ এই গল্পে দারোগা এবং বিরসা মাঝির সঙ্গে ঘটা ঘটনার প্রেক্ষিতে মানুষের মনের অবদমিত ইচ্ছা পূরণের কথাকেই ভাষায়-শব্দে-বাক্য গঠনের প্রাঞ্জলতায়, সংলাপ-চরিত্রের সামঞ্জস্য পূর্ণতায় বিষয়টিকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

মানুষের মন, তার আচরণ কিংবা তার স্বভাব যে কত বিচিত্র রকমের হতে পারে — তার অনুসন্ধানে রত হয়েছিলেন বিদগ্ধ সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী। আর তাঁর সেই অন্বেষণের সূত্র ধরেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এমন বিচিত্র স্বভাবের মানুষকে, যাঁরা বাহ্যিক চেহারার দর্শনে স্বাভাবিক মানুষ বলে পরিগণিত হলেও বিশেষ পর্যবেক্ষণের বিচারে অস্বাভাবিক-অসুস্থ মনের মানুষ হিসেবেই তারা হয়ত মানানসই। তাই মানুষের বিচিত্র স্বভাবের এবং বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গল্প 'বিবেকের গণ্ডী' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা, কথকের মুখে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্প কথকই এখানে গল্পের একটি কেন্দ্রিয় চরিত্র। গল্পটির প্লট নির্মিত হয়েছে — গল্প কথক ও বৃদ্ধ মহেশবাবুর মধ্যে দেনা-পাওনার হিসেবের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই। গল্পের উদ্দেশ্য একমুখী, মেদবিহীন উপযুক্ত কাহিনী কথন-বর্ণন এবং সংলাপের যথার্থ ব্যবহারে পাঠককে গল্পের

মূল নির্যাস নিতে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

'বিবেকের গণ্ডী' গল্পটির কাহিনীর কেন্দ্রিয় চরিত্রটি হল বৃদ্ধ বড়লোক ব্যবসায়ী মহেশবাবু। লেখক তাঁর চরিত্রের সততা-সদাচারের উদাহরণে যে ভাষার প্রয়োগ করেছেন — তা পাঠকের কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে — ''গল্প শুনেছিলাম যে মহেশবাবুর নাকি কোনো পাওনাদার নেই; আর কেউ নাকি তাঁর ওখান থেকে খালি হাতে ফিরে আসে না।''[১৬৭] সদাচার ছাড়াও মহেশবাবুর চরিত্রের আরেকটি বড় গুণের কথাও লেখক জানিয়েছেন গল্পে, তা হল পরোপকার করার ইচ্ছে — 'কারও উপকার করতে পারলে তিনি সত্যই কৃতার্থ হয়ে যান।' মহেশবাবুর হিসেবের জ্ঞান টনটনে। তিনি কারও এক পয়াসা ফাঁকিও যেমন দেন না, তেমনি কাউকে বিনা কারণে অতিরিক্ত এক পয়সাও দেন না। মহেশবাবু এহেন স্বভাবের পরিচয়ে লেখক একটু লঘুরসের আশ্রয় নিয়েছেন ঠিকই তবে তার মধ্য দিয়ে চরিত্রটির নৈতিকতার দিকটিকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। যেমন — গল্প কথক যখন মহেশবাবুর নাতি-নাতনীদের টিউশনি পড়ানো ছেড়ে দেয়, তখন মহেশবাবু কথকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার টাকা তাকে দিয়ে পাঠায় বাড়ির চাকরের হাতে। কিন্তু কথক সে টাকা ফেরৎ পাঠালে মহেশবাবু মানি অর্ডার করে টাকাটা পাঠিয়ে দেন মানিঅর্ডারের খরচটা বাদ দিয়ে এবং যতদিন পর্যন্ত কথকের প্রাপ্য ১৬ (ষোল) টাকা শেষ হয়ে না যায় তত দিন পর্যন্তই মানিঅর্ডারের টাকা পাঠানো চলতে থাকে। এই অংশটিতে সতীনাথ যে ভাবে সংলাপকে সাজিয়েছেন তা একটু দেখে নেওয়া যাক —

> ''প্রথম দিন মহেশবাবুর বাড়ির চাকর আমার নামে একখানা চিঠি নিয়ে হাজির। খুলে দেখি তার মধ্যে তিনখানি পাঁচ টাকার নোট আর একখানি এক টাকার নোট। ... টাকাটা নিতে আমার বিবেকে বাঁধল। ... সেই চাকরের হাতেই টাকা কয়টা ফেরত দিলাম। ... ভাবলাম ব্যাপারটা মিটল; ... দিন তিন-চার পরেই মানিঅর্ডার এল একখানা আমার নামে। প্রেরক মহেশবাবু। কুপনে লেখা — 'মানিঅর্ডার কমিশন বাদ দিয়া পনর টাকা বারো আনা পাঠাইলাম।' মহা ফাঁপরে পড়লাম। ... ফেরত দিয়েও নিস্তার নেই; দিন কয়েক পর আবার টাকা এল। এবার পনর টাকা আট আনার। ... এবার মানিঅর্ডার ফেরত দেবার সময় সে বুঝে গেল যে, আমার আর মহেশবাবুর মধ্যে এ একরকম খেলার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ খেলায় আনন্দ নেই।''[১৬৮]

কিন্তু গল্পের আসল জায়গা এটা নয়। গল্পের মূল জায়গায় পৌঁছনোর জন্য সতীনাথ মহেশবাবু চরিত্রের নানা নৈতিকতা, সততার উদাহরণ দিয়েছেন এসবের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু শেষে পৌঁছে মাত্র একটি বাক্যেই তিনি মূল জায়গাটিকে কি দারুণ পারদর্শিতায় পাঠককে ধরিয়ে দিয়েছেন তা অবশ্যই দেখবার মতো বিষয়। গল্পের শেষে পৌঁছে দেখা যায়, মহেশবাবু কথকের কাছে এসেছেন তাকে দিয়ে ইনকামট্যাক্স রিটার্নের ফাইল তৈরী করাবার জন্য। কারণ তিনিও ইতিমধ্যে অন্যান্য সকলের মতই জেনে গেছেন ইনকামট্যাক্স অফিসারের সঙ্গে কথকের একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। আর তাই কথকের কাছে এসে নৈতিকতা-সদাচারের সততার প্রতীক মহেশবাবু বলেন — ''তোমার সঙ্গে

তো শুনি ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের খুব আলাপ। আমার রিটার্নটা তোমাকে দিয়েই দাখিল করাব ঠিক করেছি।"[১৬৯] বলাবাহুল্য, মহেশবাবু চরিত্রের এই সংলাপ থেকেই পাঠক আন্দাজ করে নিতে পারেন তাঁর বিবেকের গণ্ডীকে। এরপর তাঁর সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা দিতে সতীনাথ খুব ছোট একটি বাক্যের সংলাপ দিয়েছেন — "বসাকদের গোলা থেকে পাওয়া সুদের টাকাটা দিওনা রিটার্নে। অফিসার পরে যদি গোলমাল-টোলমাল করে, তখন তুমি তো আছই।"[১৭০] মহেশবাবুর সততার-নৈতিকতার-সদাচারের গণ্ডী, বিবেকের দহনের গণ্ডী যে নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, সরকারকে ফাঁকি দিতে কিংবা সেখানে কোনো মিথ্যাচার করতে যে তাঁর বিবেকের দংশন হবে না তা বোধহয় পাঠকের আর বুঝতে বাকী থাকে না। এই একটি কথার মধ্য দিয়েই মহেশবাবু চরিত্রটির মানসিক জটিলতা, মনের মধ্যেকার গূঢ় বিসর্পিল ভাবনাকেই ধরেছেন উল্লিখিত সংলাপের ব্যবহারে।

মানুষের নিজের মনের ওপরেই যে কখনো কখনো তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না, বাহ্যিক মন আর অন্তর্মনের চাহিদা, কাজ কর্মের মধ্যে যে বিরাট প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়ে ব্যক্তিকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন সত্তার বাইরে মনোজগতের মাধ্যাকর্ষণের টানে পুরোনো বৃত্তের মধ্যে এনে ফেলে, মানুষের মনের সেই জটিল সমীকরণের গল্প 'অনাবশ্যক' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। উত্তম পুরুষে লেখা গল্পটির প্লট নির্মিত হয়েছে একজন অবসর গ্রহণ করা ব্যবহারজীবী বৃদ্ধ উকিলের দীর্ঘদিনের আচরণগত অভ্যাসের পরিণাম ও পরিহাসের মধ্য দিয়ে। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র একটিই, তাকে কেন্দ্র করেই বা তার কার্যকলাপের প্রসঙ্গেই আরও কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে ঠিকই — কিন্তু বলাবাহুল্য তারা নিতান্ত গুরুত্বহীন। গল্পের বক্তব্য বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে মূল চরিত্রের কার্যকলাপের স্বগত বর্ণনার বা আত্মকথনের মধ্য দিয়ে। তবে গল্পটিতে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় তা হল —গল্পটির সংলাপের অধিকাংশই রচিত হয়েছে চরিত্রটির মনোগত আত্মকথনের মধ্য দিয়ে। আর গল্পটি যেহেতু একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যবহারজীবীর কর্মস্থল তাই সেখানে আদালত বা বার লাইব্রেরী সংক্রান্ত নানান ঘটনার বর্ণনা, পরিস্থিতির বর্ণনা রয়েছে তেমনি আদালতের উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগও বারংবার পাওয়া যায়। যেমন — খবরের কাগজ নিজের দখলে নিয়ে বার লাইব্রেরীতে অনান্য জুনিয়র উকিলরা যখন বৃদ্ধ অবসর প্রাপ্ত উকিলকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে তখন তিনি যে ভাবে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে যান, তাতে মনে হয় আদালতে বোধহয় কোনো মামলার সালিশি হচ্ছে — "মোটের ওপর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি আমার অধিকারের গণ্ডির মধ্যে থেকেও কাগজখানাকে সারাদিন নিজের দখলে রাখতে পারি। কাজেই আমার বিদ্বান বন্ধুর প্রথম যুক্তি ধোপে টেকে না। দ্বিতীয়ত যদি আমার বিদ্বান বন্ধু ইঙ্গিত করে থাকেন যে বৃদ্ধ সংবাদপত্রসুলভ কোনো বিশেষ ধরণের মোকদ্দমার রিপোর্ট পাবার জন্যই খবরের কাগজের ঐ পাতাটা খুলেছেন, তা হলে আমি বলব তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়।"[১৭১] কিংবা 'কাজেই আসামীর benefit of doubt পাওয়া

উচিৎ;' 'Does not hold water, your honour' — প্রভৃতি বাক্যগুলোও আদালতের ভাষা বলেই পরিচিত।

মনস্তাত্ত্বিক গল্পের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'ঈর্ষা' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্পের কাহিনীতে রয়েছে কথক ও তাঁর বহুদিনের পুরোনো ভৃত্য কালাচাঁদের সম্পর্ক এবং কথকের কুকুর পাহারাকে কেন্দ্র করে কালাচাঁদের সঙ্গে কথকের একটা রেষারেষি, মনোমালিন্য, একটা মানসিক টানাপোড়েন। কথক ও তাঁর ভৃত্য এবং পাহারাকে কেন্দ্র করেই গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে। গল্পের কাহিনী বিবৃত হয়েছে আত্মকথন রীতিতে। যদিও গল্পের বেশ কিছু জায়গায় কথক এবং কালাচাঁদের পারস্পরিক সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে তবুও কথকের জবানীতেই গল্পের মূল বিষয়টি ধরা পড়েছে। গল্পের একেবারে প্রারম্ভ থেকেই এই রীতির অনুসরণ লক্ষিত হয়। গল্পের শুরুটা একটু লক্ষ করলেই পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে লেখকের উদ্দেশ্য — "আমি লোকটি অত্যন্ত নার্ভাস ও ভীরু প্রকৃতির। যতটা সোজা ভাষায় বললাম ব্যাপার তার চাইতে অনেক গুরুতর; রোগ অনেক বেশি জটিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে পারবেন।"[১৭২] এই সামান্য উদ্ধৃত অংশটি থেকেই গল্পটির উপস্থাপন রীতির প্রমাণ মেলে। আর গল্পটি পড়তে গিয়ে মনে হয় কথক যেন কোন শ্রোতার সামনে তার জীবনের কাহিনী বলে চলেছেন। যেখানে নিজের জীবনের দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ কোন বিষয়েই সঠিক সত্যকে তিনি শ্রোতার কাছ থেকে গোপন করেন নি। যেমন, নিজের সম্পর্কে তিনি যখন বলেন — 'বন্ধু মহলে সুরসিক বলেই আমার খ্যাতি। আর দুর্নাম ভয়কাতুরে ও খামখেয়ালি বলে' তখন এই কথার মধ্য দিয়ে কথকের নিজের সম্পর্কে নিজের মূল্যায়নে পাঠক সত্যিই তার প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েন।

'ঈর্ষা' গল্পের কাহিনীতে কীভাবে লেখক কথক ও তার পুরাতন ভৃত্য কালাচাঁদের সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন তার একটু উদ্ধৃতি অবশ্যই আবশ্যক। গল্পের শুরুতেই কথক তার ভৃত্য কালাচাঁদের কথা বলতে গিয়ে বলেন — "পুরনো মোটর গাড়ির মালিক ভাবে যে আমি খুব গাড়ি চালাচ্ছি, কিন্তু আসলে গাড়িই তাঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় নিজের খেয়াল-খুশি মতো। পুরনো চাকরও ঠিক তাই। আইনত কালাচাঁদের সঙ্গে আমার প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ, কিন্তু কার্যত সেই আমার অভিভাবক, গৃহিণী ও বন্ধু।"[১৭৩] উক্ত অংশটির মধ্য দিয়ে কথকের রসিকতা করবার ক্ষমতা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি তার বৃহৎ-উদার মনেরও পরিচয় মেলে। কথকের সঙ্গে কালাচাঁদের সম্পর্কের আরও সঠিক ধারণা দিতে লেখক যে ধরণের সংলাপ রচনা করেছেন তা একটু দেখে নেওয়া যাক। পাড়ায় হঠাৎ চোর-ডাকাতের উৎপাত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভীতু প্রকৃতির লোক কথক তাঁর ভৃত্যের কাছে আত্ম সমর্পন করেন — "যত রকম সম্ভব ভয় হতে পারে, আমার আবার তার মধ্যে চোর-ডাকাতের ভয়ই সবচেয়ে বেশি। ... রাত দুপুরে ঘুম ভাঙতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ একজন মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে কী যে করব! ... 'আচ্ছা কালাচাঁদ,

দুজনে এক ঘরে শুলে হয় না?' মুখ ফুটে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটা করতেই হল। 'বলেন কী বাবু! এত জিনিসপত্তর ওঘরে! তাহলে কেমন দুখানি লাঠিই একই ঘরে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রাখা যায় — কে জানে ক'জন চোর একসঙ্গে আসে!' "[১৭৪] উদ্ধৃত সংলাপ থেকেই পাঠকের স্বচ্ছ ধারণা জন্মায় কথক এবং কালাচাঁদের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে। আর সংলাপের ভাষা প্রয়োগ লক্ষ করলে দেখা যায়, একেবারেই কথ্য-চলিত ভাষার প্রয়োগ, নিরলংকার ভাষায়, প্রভু-ভৃত্যের সংলাপ রচনা করেছেন। কথকের কালাচাঁদের ওপর ভালোবাসা-ভরসা সবই প্রকাশিত হয় এই সংলাপের মধ্য দিয়ে।

এরপর গল্প যত এগিয়েছে ততই দেখা গিয়েছে কথকের সঙ্গে তাঁর ভৃত্য কালাচাঁদের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও যেন চিড় ধরেছে 'পাহারা'কে কেন্দ্র করে। পাহারাকে একদিন সামনের মিষ্টির দোকান থেকে কালাচাঁদই তুলে এনেছিল প্রভুর মনের কোণায় জমে থাকা চোর-ডাকাতের ভয় তাড়ানোর জন্য। আর তাছাড়া কথকই প্রথম কুকুর পোষার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন বাড়ি ও তাকে পাহারা দেবার জন্য। কিন্তু এই কুকুর ছানাটিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় কথকের সঙ্গে কালাচাঁদের একটা চাপা ঈর্ষা, একটা অধিকার বোধের লড়াই। 'পাহারা' কালাচাঁদের সঙ্গেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, কালাচাঁদের সঙ্গেই তার সখ্যতা গড়ে ওঠে, কথককে দেখে সে ভয় পেয়ে ছুটে পালায় কালাচাঁদের কাছে। আর এ নিয়েই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হল। কথকের মনে পাহারাকে নিয়ে কালাচাঁদের সঙ্গে ঈর্ষাবোধকে স্পষ্ট করেছেন যে সংলাপে তা উল্লেখেই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় পাঠকের কাছে — "মনে হতে লাগল যে, কালাচাঁদ যদি অন্তত পক্ষে আমার কুকুরের ব্যাপারে সর্দারি না করত তাহলে বড় ভালো হতো।"[১৭৫] "কালাচাঁদের মুখে পাহারার প্রশংসার গল্প সত্যিই আমার ভাল লাগে না আজকাল। ... তবু কি কালাচাঁদ রেহাই দেবে? খাওয়ার সময়টুকুতে পর্যন্ত কামাই নেই; এক এক সময় অসহ্য বোধ হয়।"[১৭৬]

"এরপর থেকে আমার আর তার মধ্যের সহজ সম্পর্কটা আর জীইয়ে রাখা সম্ভব হয় না। চেয়েছিলাম পাহারাকে আমার কুকুর, একান্ত আমার কুকুর করে তয়ের করতে। পারিনি। ... কালাচাঁদের কাছে হেরে গিয়েছি; দিন দিন একটু একটু করে তার শক্তি বাড়ছে আর আমার কমছে, অষ্ট প্রহর একথাও আমাকে পীড়া দেয়।"[১৭৭] উপরোক্ত সবকটি সংলাপ থেকেই কথক ও তাঁর ভৃত্য কালাচাঁদের সম্পর্কের টানাপোড়েনের প্রমাণ মেলে।

তবে এই টানাপোড়েন এবং ঈর্ষাবোধ যে কেবলমাত্র কথকের মনের একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র, কালাচাঁদ যে কোনদিনই পাহারাকে আলাদা করে নিজের করে নেওয়ার জন্য এসব কিছু করেনি, বরং সে তার মনিবের কাছে পাহারাকে তার মনের উপযুক্ত করে তৈরী করার জন্যই সব করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় গল্পের শেষে পৌঁছে। আর কালাচাঁদ যে প্রকৃত পক্ষেই তাঁর প্রভুকে মন থেকে ভালোবাসত তারও পরিচয় মেলে তার আচরণ থেকেই। কালাচাঁদ সব কিছুর পরও তার প্রভুকে ছেড়ে চলে যায় না। আসলে কথকই যে তাঁর মনের কোণে জমা ভয়, ঈর্ষা থেকেই কালাচাঁদকে

কীভাবে ভুল বুঝেছিলেন তারই কাহিনী এই গল্পটি।

গল্পের বাক্য গঠন রীতি, শব্দ প্রয়োগ, চরিত্রের মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনাকে বোঝাতে যে ভাবে সংলাপকে রচনা করেছেন, যেভাবে কথকের মনের সাময়িক ঈর্ষা, মানসিক একটা টানাপোড়েন তৈরি করেও গল্পের শেষে আবার মনিব-ভৃত্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন তা যেমন অনবদ্য তেমনি গল্পটি কাহিনী-চরিত্র-সংলাপ এবং স্থান-কাল-পাত্র সবকিছুর নিরিখেই গল্পটি শিল্প সার্থক হয়ে উঠেছে।

সতীনাথের আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'দুই অপরাধী' (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)। নিতান্ত যোগসূত্রহীন হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাও যে মানুষের মনের মধ্যে দাগ কেটে যায়, মানুষের জীবনকে কখনো কখনো বিব্রত করে তোলে তারই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 'দুই অপরাধী' গল্পটি। তবে গল্পটির কাহিনী নির্মাণে এবং উপস্থাপনায় লেখক এখানে তাঁর অন্যান্য গল্পগুলির মত স্বচ্ছন্দতা-সাবলীলতা দেখাতে পারেন নি। গল্পটির কাহিনী বর্ণন বেশ খানিকটা অবিন্যস্ত বলেই মনে হয়। গল্পটি একটি ঘটনা দিয়ে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে অন্য একটি ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পরবর্তীতে সেই ঘটনাটি প্রাধান্য পায়। এখানে অবশ্য গল্প শুরুর ভঙ্গিটি একটু ভিন্ন ধরণের — এখানে গল্পের শুরু মূলত কাহিনীর শেষ থেকে। কোন একটি হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার রেশ থেকেই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্রের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রকাশ দিয়েই এই গল্পের শুরু — "এই যে! এসে গেল! সাইকেলের ঘন্টার শব্দ! ... বুক দুরদুর করছে অমলেশের। 'খবরের কাগজ!' "[১৭৮] গল্পের এই শুরুর অংশটি থেকে পাঠক গল্পটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু আন্দাজ করতে পারে না। গল্পটির কাহিনী অংশের মত প্লট নির্মাণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পাঠক বেশ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রথমে মনে হয় দুই অল্প বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর অমলেশ ও গীতার পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা মান-অভিমানকে কেন্দ্র করে গল্পের প্লট রচিত হয়েছে। কিন্তু গল্প যত এগোতে থাকে ততই গল্পে প্রাধান্য পায় একটি অপরিচিত-অসুস্থ নারীর করুণ জীবনধারার কাহিনী। তবু গল্পে দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী নির্মিত হয়েছে তাকে সরলরৈখিক প্লটের অর্ন্তভুক্ত করাই বোধহয় শ্রেয়। কারণ সম্পূর্ণ দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে জীবনের মধ্যে থাকা নানা জটিলতা মানুষের মনোবৃত্তির অজানা-অদেখা-অবিশ্বাস্য রহস্য ঘেরা জটিলতাকে লেখক এখানে রূপ দান করেছেন দুটি সমান্তরাল কাহিনীর মধ্য দিয়ে।

সতীনাথের মনস্তাত্ত্বিক গল্পের ধারায় আরেকটি বিশেষ গল্প 'অলোকদৃষ্টি' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ)। এই গল্পে সতীনাথ তাঁর করায়ত্ত করা বাক্ চাতুর্যে একজন বৃদ্ধার মনস্তত্ত্বকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা প্রসংশনীয়। একজন বৃদ্ধা যে তাঁর নিজের মৃত্যু ভয় থেকে নিজের সন্তানদের সম্পর্কে তাঁর মনে একদিন নিছকই যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল — তা যে সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না, কোন একটি ভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সেই বৃদ্ধার নিজের মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি কি ভীষণ ভাবে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল

— তারই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ 'অলোকদৃষ্টি' গল্পটি। যে দৃষ্টি ভঙ্গিতে সতীনাথ এখানে বৃদ্ধার মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন তা অনবদ্য। গল্পটির সংলাপ গঠনের অপূর্ব কৌশল গল্পটির গ্রহণযোগ্যতাকে অনেকাংশেই বর্ধিত করেছে।

সতীনাথ ছিলেন একজন বড় মাপের স্যাটায়ারিস্ট। তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে বেশ অনেক গল্পেই পাঠক খুঁজে পাবেন ব্যঙ্গরসের বেশ কিছু খোঁচা। তিনি সমাজের ও মানুষের নানা কুসংস্কার, নিয়ম-কানুন, নানা আচার-আচরণ, স্বভাবকে কখনো প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গের কষাঘাতে বিদ্ধ করেছেন, আবার কখনো প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আধারে বিষয়টির প্রতি পাঠক ও সমাজের গোচরীভূতদৃষ্টি আকর্ষণ করে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন। গবেষণা অভিসন্দর্ভটির পূর্ববর্তী অন্যান্য শ্রেণীর মত।।।ই ব্যঙ্গরসের শ্রেণীভুক্ত গল্পগুলির আলোচনায় জীবন চিত্রণকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে ব্যঙ্গরসের প্রধান প্রধান গল্পগুলি উপস্থাপন পদ্ধতি, প্লটের ব্যবহারে, কাহিনীর কথন ভঙ্গিতে, চরিত্রের স্বভাব কিংবা অভ্যাসকে রূপদানে ভাষার বা সংলাপের ব্যবহারে গল্পগুলির বাক্-নির্মিতি কীভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে তাকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

সতীনাথের ব্যঙ্গরসের গল্পগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'মা আম্রফলেষু' (১৩৭১ বঙ্গাব্দ)। এই গল্পটিতে সতীনাথ তাঁর সরস ব্যঙ্গের কষাঘাতে বিদ্ধ করেছেন আমাদের সমাজের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি, অসদাচার, নিজের দায়িত্বে চূড়ান্ত অবহেলা বা ফাঁকি, সরকারী অর্থে নিজেদের উদরপূর্তি প্রভৃতি বিষয়গুলিকে। গল্পটির নামকরণেই একটা সরসতা পাঠকের চোখে পড়ে। সেই সঙ্গে গল্প শুরুর থেকেই যে বিষয়টি পাঠকের চোখে পড়ে তা হল চরিত্রের প্রতি লেখকের শ্লেষ মিশ্রিত বিদ্রূপ। গল্পের কেন্দ্রভূমি এবং উদ্দেশ্য সরকারী আম-রপ্তানি-কর্পোরেশনের অফিস এবং সেখানকার অফিসার থেকে সাধারণ কর্মীদের অসৎ আচরণ, কর্ম সংস্কৃতির চূড়ান্ত অসাফল্যকেই তির্যক দৃষ্টিতে পাঠকের কাছে ধরিয়ে দেওয়া। গল্পটির উপস্থাপন পদ্ধতিতে বিবৃতিধর্মিতার সঙ্গে নাটকীয়তাও মিশে রয়েছে। আর গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার থেকে অধস্তন সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তৈরী হওয়া মিথ্যাচার, অনাচারকে কেন্দ্র করে। গল্পে বৃত্তাকার প্লটের ব্যবহারে লেখক দেখিয়েছেন যে সরকারী অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কীভাবে সরকারী অর্থের এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে থাকেন। এই গল্পে মিঃ মুখার্জি চরিত্রটি এবং তার অধস্তন কর্মচারী আমাপ্পা, শ্রী ঝা, শ্রী ফারুক আহমেদ সহ অন্যান্য চরিত্রদের আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে লেখক কঠোর বিদ্রূপ করেছেন আমাদের সমাজের একদল সরকারী অফিসার এবং কর্মচারীদের। যারা নিজেদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, গভর্ণমেন্টের টাকার অপব্যবহার করে, নয়-ছয় করে নিজেদের ব্যক্তিগত কার্যসিদ্ধি করেছেন এবং সেই সঙ্গে লেখক পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে এটাও দেখিয়েছেন যে সরকারী

অফিসের অফিসার থেকে সাধারণ কর্মচারী সকলেই একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে কীভাবে সরকারের চোখে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছে।

গল্পের শুরুতেই তাই দেখা যায় স্থানীয় অফিসের বড়বাবুর কাছে হেড অফিস বোম্বে থেকে বড় সাহেবের অর্থাৎ মিঃ মুখার্জি প্রেরিত একটি ভর্ৎসনামূলক চিঠি এসেছে — "... তথ্য সংক্রান্ত যাহা কিছু লিখিয়া পাঠাইবেন তাহাই আমাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। ... আপনার প্রেরিত এই সমাচারের মধ্যে আমি দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টার গন্ধ পাইতেছি।"[১৭৯] অনুসন্ধিৎসু-উৎসাহী পাঠক মাত্রই গল্পটি শেষ প্রান্তে গিয়ে বুঝতে পারেন মিঃ মুখার্জি এই চিঠি পাঠানোর আসল কারণ।

মিঃ মুখার্জি যে নিজের শ্যালিকার বিয়েতে যোগদান করার জন্য সরকারী খরচে নিজের ও পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে বোম্বে থেকে বিহারে আসার জন্য একটা inspection-এর অজুহাত তৈরী করে তার অধস্তন অফিসার স্থানীয় অফিসের বড়বাবুকে 'হুড়ো' দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। তারপর ঠিক শ্যালিকার বিয়ের দিন তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে 'surprise inspection' করে অফিসের ছোট-বড় অনেক কর্মচারীর কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে শ্রী আমাপ্পাকে বলেন 'এঁদের বিরুদ্ধে 'Proceedings draw up' করুন শ্রী আমাপ্পা।' মিঃ মুখার্জির এই 'surprise inspection' সম্পর্কে সতীনাথ তির্যক শ্লেষ মিশ্রিত ভঙ্গিতে জানিয়েছেন — "মুহূর্তের মধ্যে অফিসের সবাই জেনে গিয়েছে যে, বোম্বাই থেকে মুখার্জি সাহেব এসেছেন surprise ইনসপেকশন দিতে। ... বড় কড়া লোক শৈলেন মুখার্জি। ... কারও মুখ চেয়ে কথা বলেন না। ... নিশ্চয়ই কোনো ভয়ঙ্কর রকমের বড় গলদের খবর পেয়ে এসেছেন এখানে।"[১৮০]

কিন্তু এই মিঃ মুখার্জির হঠাৎ ইন্‌সপেক্‌শনের পেছনে যে আসল কারণ ছিল, তাকেও সতীনাথ সরস ভঙ্গিতে শ্লেষের মিশ্রণে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে পাঠক মিঃ মুখার্জি চরিত্রটির আসল রূপ বুঝে নিতে পারেন। মুখার্জি সাহেবকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা এবং নিজের সমূহ বিপদকে খানিকটা কমানোর জন্য যখন শ্রী আমাপ্পা তাঁকে রাত্রিতে ডিনারের জন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন, তখন মিঃ মুখার্জির সংক্ষিপ্ত উত্তর — 'দুঃখিত। সময় হবে না।' কিন্তু শ্রী আমাপ্পাও 'মহিষাসুরের বাচ্চা', তাই এতটুকু না দমে গিয়ে তিনি মিঃ মুখার্জির আসার আসল কারণ জানতে চেষ্টা করেন। আর তা জানতে গিয়েই শ্রী আমাপ্পা যে চরম সত্যের সম্মুখীন হন তার সংহত বর্ণনায় পাঠক লেখকের মননশীলতায়, ভাষাকে ইঙ্গিতময় কৌশলে ব্যবহারের মুন্সীয়ানায় বিস্মিত হয়ে যান — "সব ভদ্র হোটেলে খোঁজ করা হল। কোথাও শ্রী মুখার্জির হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু শ্রী আমাপ্পা দমবার পাত্র নন। দক্ষিণ ভারতীয় অধ্যবসায় তাঁর শিরায় শিরায়। পরদিন সকালে তিনি শ্রী মুখার্জিকে খুঁজে বার করলেন তাঁর শ্বশুর বাড়িতে। তাঁর চেনা মুখের অপ্রস্তুতের ভাবটা শ্রী আমাপ্পার দৃষ্টি এড়াল না।"[১৮১]

এখানেই শেষ নয়, মিঃ মুখার্জি চরিত্রটির মিথ্যে আচরণ, অনৈতিকতা সম্পর্কে পাঠকের

আরও স্পষ্ট ধারণা হয় কথকের যে বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা হল — "শ্রী মুখার্জি এসেছেন শালীর বিয়েতে। সেদিন বাসি বিয়ে। আগের দিন ডিনারের নেমতন্ন কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তার কারণ পরিষ্কার; কিন্তু তার চেয়েও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে কী জন্য তিনি অমন কড়া চিঠি দিয়েছিলেন শ্রী আমাপ্পাকে। Surprise Inspection -এর অজুহাত সৃষ্টি না করে নিলে সরকারী খরচে শালীর বিয়েতে আসা হত না তাদের।"[১৮২] এমন শ্লেষ মিশ্রিত ব্যঙ্গ বোধহয় সতীনাথের পূর্বজ পরশুরাম ছাড়া অন্যত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। সতীনাথ কত বড় স্যাটায়ারিস্ট ছিলেন তা বোঝা যায় শ্রী আমাপ্পার বলা একটি বাক্য থেকেই — "বিয়ে বাড়ির মিষ্টি এল। গল্প জমে উঠল। শ্রী আমাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন — 'আপনার শালীর বিয়ে হঠাৎ ঠিক হয়েছিল বুঝি?' 'হ্যাঁ'। সামান্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট, বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে। ঝাঁজ মরেছে শ্রী মুখার্জির।"[১৮৩] তাঁর আগের দিনে অফিসে ঢুকে যে তেজ ছিল, যে দৃঢ় ভঙ্গিতে তিনি শ্রী আমাপ্পাকে হুকুম দিয়েছিলেন কর্মচারীদের নামে শোকজ নোটিশ ধরানোর জন্য, নিজের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মিঃ মুখার্জির সুর একেবারে নরম হয়ে গেল। তাই শ্রী আমাপ্পা তাকে যখন বলেন — "আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি, একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের চটিয়ে লাভ নাই। কালকের সেই ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই বোধহয় ভাল, কী বলেন?"[১৮৪] তখন মিঃ মুখার্জির স্তিমিত-সংক্ষিপ্ত উত্তর — "ওদের নিয়ে কাজ চালাতে হবে আপনাদেরই। যা ভাল বোঝেন করবেন।"[১৮৫] এই দুটি বাক্য থেকেই মিঃ মুখার্জির অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করার মানসিকতাও পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই গল্পে সতীনাথ ব্যঙ্গের সুরে পাঠককে দেখিয়েছেন সরকারী অফিসগুলোর উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অফিসার থেকে সাধারণ কর্মচারীদের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপপ্রয়োগকে। নিজেদের প্রকৃত দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা কীভাবে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকেন তারও একটি জীবন্ত উদাহরণ রয়েছে এই গল্পে। যে বাক্য, ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, তাদের কর্মসংস্কৃতিকে নষ্ট করে দেওয়ার প্রবণতাকে সতীনাথ যেভাবে তুলে ধরেছেন, তাতে পাঠকও যেন বাস্তব অভিজ্ঞতাই লাভ করে — "ধুতি, পাঞ্জাবি, টুপি পরা একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক কাজে এসেছেন আম রপ্তানি কর্পোরেশনের অফিসে। ... কাউন্টারে অফিসের কোনো লোক নাই! বহুক্ষণ অপেক্ষা করবার পরও সেখানে কেউ আসে না দেখে তিনি কাঠের উপর ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে জটলারত কেরানীবাবুদের দৃষ্টি আকর্ষিত করবার চেষ্টা করলেন। সকলে দেখেও দেখে না।"[১৮৬] এরপর ঐ ব্যক্তিটির সঙ্গে ঘটা ঘটনার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে শুধু সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই প্রমাণিত হয় না, তার সঙ্গে তাদের চূড়ান্ত অমানবিকতা এমনকি সংবিধান বিরোধী আচরণেরও প্রমাণ পাঠক পেয়ে যায় — " 'মশাই, এটা গভর্ণমেন্টের অফিস না কী! দেড় ঘন্টা থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফেটে গেল! আমাদের সময়েরও দাম আছে।' গল্পরত বাবুরা কাউন্টারের দিকে না তাকিয়ে আর পারলেন না। 'কী তখন থেকে হল্লা করছেন এখানে।' হল্লা করছি, কাজের জন্য এসেছি এখানে।'

... 'ফের যদি চেঁচামেচি করেন, কান ধরে বার করে দেব অফিস থেকে।' 'সরকারী অফিসে, কাজের জন্য এসেছি। বার করে দিলেই হল!' এরপর আর মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায় না। চার-পাঁচজন কেরানীবাবু একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আস্তিন গুটিয়ে। 'ভালমানুষের বাপ আঁটকুড়ো! যাও! বেরিয়ে যাও এ অফিস থেকে! অভী নিকলো!' ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে তাঁরা ভদ্রলোকটিকে করিডোর দিয়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।"[১৮৭] সরকারী অফিসে আগত ভদ্রলোক এবং সরকারী অফিসের কেরানীবাবুদের এই বাগ্-বিতণ্ডা এবং সর্বোপরি কেরানীবাবুদের কৃত আচরণ থেকেই পাঠক তার অনেক অজানা বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে নিতে পারেন অনায়াসে।

সতীনাথ এই গল্পে সরকারী কর্মচারী, অফিসারদের আচার-আচরণ, অনৈতিক কাজ-কর্ম, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং সর্বোপরি নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনকে যে সংলাপের মধ্যে দিয়ে, যে ভাষার তীক্ষ্ণবাণে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত দূরদর্শিতায়, বাস্তবের সঙ্গে, সামান্য কাহিনীর সংযোগে বিষয়টির উপর আলোড়ন সৃষ্টি করে সমাজের এই ধরণের মানুষের প্রতি গভীর শ্লেষ-খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন — তাতে গল্পকারের উদ্দেশ্য যেমন সার্থক হয়েছে, তেমনি চরিত্র, কাহিনী উপস্থাপন, যথোপযুক্ত সংলাপ রচনার মধ্য দিয়ে গল্পটির বাক্ নির্মিতিও ততটাই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

'জোড়কলম' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) গল্পটিতেও সতীনাথ একই রকম ভাবে তির্যক ব্যঙ্গের কষাঘাতে প্রকাশ করেছেন সরকারী শাসন ব্যবস্থা বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার 'বজ্র আটুনি ফস্কা গেঁরোর'-রহস্যকে। সেই সঙ্গে পূর্বের গল্পগুলির মতোই সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিকে জনসমক্ষে আরেকবার প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। 'জোড়কলম' গল্পটিও বর্ণনামূলক। গল্পের প্লট নির্মাণ হয়েছে এক্সাইজ সাব-ইন্সপেক্টর হারাণচন্দ্র এবং ক্রিমিনাল কোর্টের নাজির কৃষ্ণপদবাবুর আইন বিরোধী দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া এবং শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের সাহায্যেই তা থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। লেখকের ব্যঙ্গের তীব্রতা কতখানি তা বোঝা যায় গল্পে হারাণবাবু এবং কৃষ্ণপদবাবু সম্পর্কে বর্ণিত সংলাপের মধ্য দিয়ে — "ব্যবসায় নির্বাচনের প্রতিভাও ছিল অনন্য সাধারণ। হাতে কলমে তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন, যে কারবারে পুঁজি কম লাগে, বিপন্নকে সেবার ভাব বজায় থাকে, লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয় না, সেই রূপ কারবারই মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে উপযোগী। পথিকৃৎ হিসাবে 'হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' এবং 'কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়' এই দুই কর্মবীরের নাম বাঙালীর ব্যবসায়িক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।"[১৮৮]

হারাণবাবু এবং কৃষ্ণপদবাবু চরিত্র দুটির অসততা, জালিয়াতি, দুর্নীতিকে তুলে ধরার জন্য সতীনাথের বাক্য প্রয়োগের দৃঢ়তা-বলিষ্ঠতা-নির্ভীকতা প্রসংশনীয় — "সরকারী চাকরি করিতেন বটে দুই জনেই, কিন্তু বিভিন্ন বিভাগে। শুধু এক শুভক্ষণে চাকরিতে বদলির ফলে তাঁহারা এই মহকুমা শহরে আসেন। ... দুই জনেরই বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। চাকরিতে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ছাপোষা মানুষ। উপরি রোজগার

ছিল বলিয়াই কোনো রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত।"[১৮৯] উদ্ধৃত অংশের 'ছাপোষা মানুষ' এবং 'উপরি রোজগার' এই শব্দ-বন্ধ যুগলের ব্যবহারের তাৎপর্য অনেক ছোট্ট একটি শব্দের ব্যবহারে অনেক বড় একটি বিষয়কে ইঙ্গিত করেছেন এখানে। 'উপরি রোজগার' কথাটির মধ্য দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের একাংশের দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়াকে বিদ্রূপ করেছেন। নাজিরবাবু এবং সাব-ইনস্‌পেক্‌টরবাবুর কাজ-কর্মের অসততা প্রমাণিত হয় উদ্ধৃত সংলাপে — "নাজারতের সিন্দুকে একটি সোনার গহনা বহুকাল হইতে পড়িয়া ছিল। ... কোনো দাবিদার না থাকিলে নাজিরের নিকট জমা করা বাজে জিনিসগুলি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মধ্যে মধ্যে পুড়াইয়া ফেলা হয়। সোনার গহনা অবশ্য এ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। কন্যার বিবাহের সময় অভাবগ্রস্ত নাজিরবাবু উপরোক্ত গহনার সোনাটুকু কাজে লাগাইয়া ছিলেন। এই চুরি ম্যাজিট্রেট সাহেব আজ ধরিয়া ফেলিয়াছেন।"[১৯০] আবার সাব-ইন্সপেক্‌টরবাবুর চুরির কথা পাঠক জানতে পারে — "...স্থানীয় দিশী মদের দোকান ইন্সপেক্‌শনের ফলে আবিষ্কার করেন যে, সেখানে মদ ছাড়া চোরাই গাঁজাও বিক্রয় করা হয়। সাংঘাতিক অপরাধ। ... সাবইন্সপেক্‌টরের সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাঁহার নাকের সম্মুখে এরূপ আইন বিরুদ্ধ কার্য হইতে পারে না। কথা মিথ্যা নয়। এজন্য মদের দোকানদারের নিকট হইতে প্রতি মাসে কিছু বরাদ্দ প্রাপ্য ছিল।"[১৯১]

তবে এই গল্পে সতীনাথ এই দুইজন সাধারণ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদ্বয়ের দুর্নীর্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও যে কথাটি পাঠকের গোচরীভূত করেছেন যে — তার পরিধি অনেক বিস্তৃত। তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে সতীনাথ এই গল্পের মধ্য দিয়ে এই চরম সত্য প্রকাশ করেছেন। ছোট-ছোট কর্মচারীরা যেভাবে দুর্নীর্তিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তার পেছনে তাদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা যেমন দায়ী — তেমনি দায়ী ছোট থেকে বড় সকল সরকারী কর্মচারীদের একশ্রেণীর মধ্যে কর্মসংস্কৃতির অপলাপ। সতীনাথ এই গল্পে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সেই সকল বড় বড় অফিসারদের চরিত্রিক অবনমন-অসৎ আচরণ এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন কেউ ব্যঙ্গের তীরে বিদ্ধ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন হারাণবাবু বা কৃষ্ণপদবাবুর মতো ছোট ছোট কর্মচারীরা দুর্নীর্তির পথে হাঁটতে সাহস পান কীভাবে। কীভাবে তাদের উর্ধ্বতন অফিসাররাই নিজেদের অবস্থানকে সম্মান-পদমর্যাদাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিচ্ছেন। বড় বড় সাহেবদের চারিত্রিক স্খলনকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তার একটু উদাহরণেই অনেক অচেনা-অজানা তথ্য পাঠকের সামনে উঠে আসবে — "কলিকাতার বাবুর্চি একবার আসিয়া আশ্বাস দিয়া গেল যে, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই। ... যে সকল সাহেব প্রাতঃকাল হইতে শরাব লইয়া বসে, তাহাদের খুশী করা খুব সহজ।"[১৯২]

শেষ পর্যন্ত এক্সাইজ সাবইন্সপেক্‌টরবাবু অর্থাৎ হারাণবাবু এবং নাজির বাবু অর্থাৎ কৃষ্ণপদবাবু চুরি এবং বেআইনি কর্মকাণ্ডের মতো অপরাধ মাপ করেছেন সাহেবরা। তারাও দুই অধস্তন কর্মচারীর অসৎ কর্মকাণ্ডকে ঢাকতে নির্দেশ দেন — "এক্‌সাইজ-কমিশনারসাহেব তাড়া দিলেন

ইন্সপেক্টর বাবুকে — 'সাব-ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে খবর পেয়ে তবে না তুমি শহরের মদের দোকান দেখতে গিয়েছিলে? অমন ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছ কেন? বুঝতে পারলে না? এই সহজ কথাটা বুঝতে তোমার মতো বুদ্ধিমান লোকের এত দেরি হওয়া উচিত নয়। 'সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে খবর পাইয়া' — এই কথা কয়টি ঢুকিয়ে দাও, তোমার রিপোর্ট আরম্ভেব জায়গাটায়'।"[১৯৩] আবার ক্রিমিনাল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নাজিরবাবুকে ডেকে তার সোনা চুরি ধরা পড়ার ব্যাপারটিকে আড়াল করতে নির্দেশ দেন — "নাজির বার করো সেই পাতাটা। পেয়েছ? পড় কী লেখা আছে। 'Gold bangles - one pair'. 'কলম আছে?' ... 'গোল্ড এর আগে রোল্ড কথাটা লিখে দেবে তুমি, বুঝেছ। রোল্ড গোল্ড-এর জিনিস যদি তিন বছর নাজারাতে পড়ে থাকে তাহলে সেটাকে নষ্ট করে দিলে কোনো অপরাধ হয় না। রোল্ড কথাটার বানান জান? জান না? আর, ও, এল, এল, ই, ডি — রোল্ড। না না, আমার চোখের সম্মুখে লিখতে হবে না।"[১৯৪]

সরকারী স্তরে এক শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে বড় বড় অফিসার অর্থাৎ কর্তাব্যক্তিরাও যে পুরোপুরি ভাবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন, তারাও যে সরকারের অর্থ নয়-ছয় করে নিজের সার্থ সিদ্ধি করতেই তৎপর হন, তার ব্যঙ্গবহুল তির্যক রসের রচনা 'জোড় কলম' গল্পটি। সতীনাথ একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন একথাও বলা যায়। তিনি তাঁর ব্যঙ্গরসের গল্পগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের সকল স্তরে, রাজনীতি থেকে সরকারী অফিস সর্বস্তরের লোকেদের মধ্যেই যে অসৎ-দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বার্থপর, লোভী, ব্যক্তিরা রয়েছে — যারা কোন কিছুর পরোয়া না করে নিজেদের অসৎ কর্মকে ক্রমাগত পর্যায়ে জারি রেখে যায় — তাদের অসৎ চরিত্র তথা আচরণকে ব্যঙ্গ করতেই এই শ্রেণীর গল্পগুলির অবতারণা করেছেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্ভিক চিত্তে তিনি এই গল্পগুলির চরিত্র, কাহিনীকে ভাষা-সংলাপ, শব্দের সাযুজ্যপূর্ণ ব্যবহারে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা বাক্‌রীতি এবং শিল্পরীতি উভয় দিক থেকেই সার্থক নামা হয়েছে।

সতীনাথের ব্যঙ্গরসের গল্পগুলির মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'এক ঘন্টার রাজা' (১৩৭১ বঙ্গাব্দ)। এই গল্পটিতেও সতীনাথ আশ্চর্য কৌশলে, শ্লেষের সাহায্যে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সরকারী কর্মচারীদের অসততাকে। বিশেষ করে একশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী যারা ঘুষ দেওয়া বা নেওয়াটাকে ন্যায্য কাজ বলে মনে করেন। আর এর সঙ্গে আমাদের সমাজের সেই সকল মানুষের কথাও জানিয়েছেন ব্যঙ্গের সুরে, যারা ক্ষমতায় থাকা কোনো ব্যক্তিকে প্রয়োজনবোধে দেবতারও উপরে স্থান দেন, আবার সেই ব্যক্তিটিই যখন ক্ষমতার বাইরে চলে যান — তখন তার দিকে ফিরেও তাকান না, তাকে তাচ্ছিল্য করতে, অপমান করতেও বাধে না তাদের। 'এক ঘন্টার রাজা' গল্পটি সেই রকমই একজন ব্যক্তির ক্ষমতায় থাকা সময়কালের এবং অবসর জীবনের দুই ভিন্ন রূপের কাহিনী। গল্পের উপস্থাপন পদ্ধতি বর্ণনামূলক হলেও সংলাপের ধারা পাঠককে বিস্মিত

করে। যেভাবে সতীনাথ এই গল্পে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে তার অসীম নির্ভিকতা এবং কঠিন সত্যকে প্রকাশ করার সাহসিকতা আজকের দিনের লেখক-পাঠক সকলের ক্ষেত্রেই অনুকরণীয় হয়েছে।

গল্পের একেবারে শুরু থেকেই কাহিনীর মূল বিষয়টির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন সতীনাথ — " 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা' —। হ্যাঁ যতক্ষণ চাকরিতে আছ ততক্ষণই শক্তি Power ক্ষমতা। তারপরই একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ — বাড়িতেও বাইরেও।"[১৯৫] এই সংলাপে লক্ষণীয় শুরুর সংস্কৃত শ্লোকটি। এই রকম একটি শ্লোককে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করে সতীনাথ কেবলমাত্র পাঠককে বিস্মিতই করেন নি — চিনিয়ে দিয়েছেন নিজের প্রবল শক্তিমানতাকে — সৃষ্টির চাতুর্যকে। গল্পের কাহিনীতে হরিশবাবু চরিত্রটির চাকরি জীবন এবং পেনশন ভোগী জীবনের বৈপরীত্যের তুলনামূলক আলোচনায় যেমন কাহিনীকে সমাপ্তির পথে নিয়ে গেছেন, তেমনি হরিশবাবুর স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে তুলে এনেছেন তার এবং অন্যান্য সহকর্মীদের দুর্নীতিগ্রস্ততার বিভিন্ন উদাহরণকে।

যেমন গল্পের হরিশবাবু চরিত্রটির অবসর প্রাপ্ত জীবনের ক্ষমতাহীন সময়ের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত কৌশলে সংহত কয়েকটি শব্দেই একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন তার অবসরের পূর্ব জীবন এবং পর জীবনের পার্থক্যকে — "কী ছিলেন, আর এখন কী হয়েছেন! ইনকাম-ট্যাক্স অফিসের হেড ক্লার্ক হিসাবে একদিন এ জেলায় দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেছেন; আজ তিনি ঢোঁড়াসাপ ... বাড়ির লোকেই পোছে না, তার আবার পাড়ার লোক! উপরি রোজগার তাঁর কম ছিল না অফিসে কাজ করবার সময়।"[১৯৬] এই সংলাপটির মধ্যে দিয়েই হরিশবাবু এবং তার মতো আর অনেক সরকারী চাকুরিজীবিদের ঘুষ প্রবণ মানসিকতাকে তীক্ষ্ণ ভাবে ব্যঙ্গের খোঁচায় বিদ্ধ করেছেন। এর সঙ্গে আরও দেখিয়েছেন হরিশবাবু নিজে এবং অন্যকেও কীভাবে এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন — "নূতন চাকরিতে ঢুকে, তড়িৎ বোস এখানে এসেছিলেন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার হয়ে। টাকা পয়সার দরকার তখন তাঁর। মাইনেতে কুলায় না। কাজকর্ম তখনও বিশেষ শেখেন নি! কাজেই হরিশবাবু সহজেই তাঁকে হাতের মুঠোর মধ্যে করে নিতে পেরেছিলেন। সেই সময় তিনি নিজেও টাকা রোজগার করেছেন খুব আর বোস সাহেবকেও বহু টাকা পাইয়ে দিয়েছেন।"[১৯৭] এই কয়টি বাক্যেই পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় হরিশবাবু এবং তার উধ্বর্তন অফিসার বোস সাহেবের নৈতিক মূল্যবোধের অবনমন তথা দুর্নীতিগ্রস্ত মানসিকতা।

কিছু কিছু সরকারী কর্মচারীদের অসৎ আচরণ, ঘুষ প্রবণ মানসিকতা, তথা চরিত্রকে যেমন তীব্র ব্যঙ্গের সাথে একেবারে আড়ালহীন ভাবে তুলে ধরেছেন — তেমনি এর সঙ্গে এটাও দেখিয়েছেন যে এই ধরণের ঘুষখোর মানুষেরা ক্ষমতা বলে লোকের সম্মান আদায় করে নেয় ঠিকই — কিন্তু ক্ষমতা চলে গেলে ছোট থেকে বড় যে কোনো লোকই তাদেরকে কটূক্তি করতে, অপমান করতে দ্বিধাবোধ করে না। গল্প থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হরিশবাবু চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর একদিন যখন তিনি তার পূর্বতন অফিসার বোস সাহেবের সঙ্গে নৌকায় সাহেবের গাড়ি পার করার জন্য ঘাটে যান তখন মাঝি-ঘাট-মালিক বোস সাহেবের সঙ্গে তাকে অফিসের বড়বাবু ভেবে নানা রকম পরিষেবা দিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু যখন জানতে পারেন যে হরিশবাবু এখন আর ইনকামট্যাক্স অফিসের বড়বাবু নেই তখন — "পা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ঘাট-মালিক। আর একটাও কথা না বলে সে বাড়ির পথ ধরল। বোঝা কাঁধে লোকের সারি তার পিছনে পিছনে চলেছে। বেঁচে গিয়েছেন খুব হরিশবাবু; পয়সা ফেরৎ চায়নি।"[১৯৮]

হরিশবাবুকে বড়বাবু ভেবে ঘাট মালিক যা যা উপঢৌকন দিয়েছিলেন, মুহূর্তেই সত্যিটা জানতে পেরে তার সব ফেরৎ নিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত হরিশবাবুর আশঙ্কাজনক মনোভাবনা যে তারা নদী পারাপারের জন্য পয়সা ফেরৎ চায়নি — এই যেন কপাল ভালো।

সতীনাথের ব্যঙ্গরসের গল্পগুলির তালিকায় আরেকটি সংযোজন 'হিসাব নিকাশ' (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)। এই গল্পে গুরুগম্ভীর কোন বিষয়কে ব্যঙ্গের আধারে প্রকাশ করেননি, এখানে অত্যন্ত হালকা চালে ঈষৎ ব্যঙ্গ ও রঙ্গের সমন্বয়ে একজন মানুষের চরিত্রের ভাবনার অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। হালকা শ্লেষ মিশ্রিত সুরে কথকের জবানীতে উঠে এসেছে এককড়ি নামক চরিত্রটির নানা চারিত্রিক অসঙ্গতির দিকগুলি। যেমন এককড়ি নামক চরিত্রটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে কথক যে সংলাপ বলেছে — "এককড়ি দাসের পরোপকারের প্রবৃত্তিটা সম্পূর্ণ নির্ভেজাল নয়। ... পরোপকার করেই সে নিজের জীবিকা সংস্থান করে।"[১৯৯] তার মধ্য দিয়ে এককড়ি চরিত্রটির স্বভাব এবং মনোবৃত্তিকে পাঠক চিনে নিতে পারে। এককড়ির নির্দিষ্ট কোন রোজগার না থাকায় যেকোন ভাবেই হোক না কেন, অন্যকে ঠকিয়ে, কিংবা ফাঁকি দিয়ে কিংবা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে নিজের লাভের অঙ্কের হিসাব করতে এককড়ি কখনোই সংকোচবোধ করে না। এককড়ির এই নিঃসংকোচ-চাতুর্যময় আচরণকে তুলে ধরতে লেখক গল্পে একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন। যেখানে দেখা যায় — একদিন একগণ্ডা ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনে যাবার সময় টিকিট ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর টিকিট চেকার তাকে রেলের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যান। সেখানে এককড়ি ও ম্যাজিস্ট্রেটের সংলাপের মধ্য দিয়েই উঠে এসেছে এককড়ি চরিত্রটির দু'কান কাটা স্বভাব-বৈশিষ্ট্য — "ওয়েটিং রুমে কোর্ট বসেছে ম্যাজিস্ট্রেটের। লট বহর স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবশুদ্ধ এককড়িকে হাজির করা হল তাঁর সম্মুখে। ... ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি সাড়ে-ছ'আনা দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন? আপনিও স্যার এই কথা বলছেন! ... লজ্জিত হবার মত কিছু আমি করিনি। রেলের নিয়ম অনুযায়ীই আমি আমার ছোট মেয়ে তিনটিকে নিয়ে যাচ্ছি বিনা টিকিটে। ... রুল দেখাবার দরকার নেই। শুধু যোগ বিয়োগ জানলেই হবে। ওই তিনটির মধ্যে বড়টির বয়স দু'বছর চার মাস। ওর কি টিকিট লাগবে? ওর বয়সটা তো আমরা অবিশ্বাস করছি। ... সম্ভব অসম্ভব বলেও তো একটা জিনিস আছে।

অসম্ভব? একটি সন্তান মায়ের পেটে থাকে কতদিন? দশ মাস? দশ মাস কেন, আমি আরও কমিয়ে দিচ্ছি। Period of gestation ২৭৩ থেকে ২৮০ দিন পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ ধরুন ন'মাস তিন দিন। আমি কন্‌শেসন্ চাচ্ছি না সার — দশ মাসই আপনি রাখুন। একজনের বয়স যদি দু'বছর চার মাস হয় এবং তার পরেরটি যদি এক বছর পর জন্মায়, তাহলে তার বয়স হয় এক বছর চার মাস। কেমন কিনা? আর আমার ছোট মেয়েটি আঁতুড় ঘর থেকে বেড়িয়েছে মাস খানেক আগে। বিশ্বাস না হয় ওর মাকে জিজ্ঞাসা করুন।"[২০০] এই সংলাপে যেমন সতীনাথের রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি এককড়ি চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর বিশিষ্টতাও পাঠককে মুগ্ধ করে। কীভাবে ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে কোন চরিত্রের আচরণগত বা স্বভাবগত অসঙ্গতিকে ফুটিয়ে তুলতে হয়, এই গল্পটি থেকেই সতীনাথের সেই পারঙ্গমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সতীনাথের আরেকটি ব্যঙ্গরসের গল্প 'জামাইবাবু' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। যদিও এ গল্পটি সতীনাথের লেখা প্রথম গল্প, যদিও এই সময় সতীনাথ পুরোদস্তুর সাহিত্য রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেননি, যদিও ছোটগল্পের শিল্পরূপ এই গল্পটিতে যথার্থ ভাবে অনুসৃত হয়নি — তবুও এ গল্পটিতে সতীনাথের নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গরস সৃষ্টির মুন্সিয়ানার আভাস পাওয়া যায়। 'জামাইবাবু' গল্পে জামাইবাবু চরিত্রটিকে সতীনাথ তাঁর নিজস্ব সংলাপে এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং এমন কিছু সংলাপ কথকের মুখ দিয়ে চরিত্রটি সম্পর্কে বলিয়েছেন — যেখানে পাঠকের এই চরিত্রটি সম্পর্কে ধারণা করে নিতে কোন কষ্ট হয় না। কলেবরের দিক থেকে প্রায় অনুগল্পের যোগ্য এই গল্পটিতে ব্যবহৃত দু'একটি সংলাপের উদাহরণের মধ্য দিয়েই জামাইবাবু চরিত্রটির মুখোশ খুলে যায় পাঠকের কাছে — "বড়দির সঙ্গে গল্প করছিলেন, ব্রহ্মচারী থাকব বলেই ঠিক করেছিলাম। আর লোকে যা মনে করে সবই যদি করতে পারত তাহলে তো কথাই ছিল না ...। ... জামাইবাবু আমাদের বাড়িতেই চলে এলেন — শ্বশুরমশাইয়ের একটু ইয়ে influence আছে কিনা, যদি একটু চেষ্টা-টেষ্টা করেন ... চাকরিও হলো। কিছুদিন পরে চাকরকে ডেকে বলেন 'আরে মঙ্গলু, আমার বিছানা আমি যে ঘরটায় শুই, তার পাশের ছোট খালি ঘরটায় করে দিস্। আর দেখিস মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিস্।' বড়দির কাছে বলেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না।' পাড়ার বন্ধু নিলয়বাবুর কাছে বলেন 'বৌটা কি ছিঁচকাঁদুনে, দাদা।' তবুও পরপর তিনটি মেয়ে হয়। ... গত কয় বছরের নিয়ম মত এবারেও মেজদির সময় এল। লেডী ডাক্তার বললেন, 'Weak constitution, কি হয় বলা যায় না।' হলও তাই। ... কিছুদিন পরে আবার জামাইবাবুকে বাজারে দেখি, দূর থেকে। ... নিলয়বাবু বলেন, 'বেশ দিয়েছে থুয়েছে — চুয়োডাঙায় বিয়ে করে এল কিনা। মেসে এসে উঠেছে।' "[২০১] এই সামান্য কয়েকটি সংলাপ থেকেই জামাইবাবু চরিত্রটিকে যেমন স্পষ্ট চেনা যায়, তেমনি সতীনাথেরও তীক্ষ্ণ শ্লেষের আড়ালে কঠোর ব্যঙ্গ করার ক্ষমতা প্রকাশিত হয়।

'একটি কিংবদন্তীর জন্ম' গল্পটিতেও লক্ষ করা যায় সতীনাথের অনায়াস স্বভাবসুলভ তির্যক ব্যঙ্গের ছোঁয়া। এখানেও বর্ণনামূলক উপস্থাপন পদ্ধতিতে কথক তথা প্রথম পুরুষে বর্ণিত সংলাপে গল্পের নওরঙ্গী চৌবের চরিত্রটির অসততা, অর্থনৈতিক দুর্নীতি তথা অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার (জাল নোট ছাপার কারখানা তৈরী করা) বিষয়টিকে সমধিক পারদর্শিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পের ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়, সংহত অথচ দৃঢ় ভাষার প্রয়োগে যেভাবে গল্পটির কাহিনীকে একমুখী করে পরিণতি দান করেছেন তাতে নওরঙ্গী চৌবে চরিত্রটির দুর্নীতিপ্রবণতা স্পষ্ট হয়ে যায়। গল্পের সমাপ্তি অংশটিও বেশ চমকপ্রদ। এই অংশে সতীনাথ তীক্ষ্ণ কৌশলে একই বৃত্তের মধ্যে দেখিয়েছেন যে — একা নওরঙ্গী চৌবে নয়, সমাজের আরও কত বিশিষ্ট ক্ষমতাধারী লোকজনও এই জাল নোট ছাপার দু'নম্বরী কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বিশেষ পদাধিকারী ক্ষমতাশীল ব্যক্তিবর্গের চারিত্রিক অসততা-অসঙ্গতিকেও ব্যঙ্গের কষাঘাতে প্রকাশ করেছেন। এ গল্পটিতে বাক্য গঠনের বিশেষ কৌশল অনুসৃত হয়েছে। রূপকের অন্তরালে একটি প্রকৃত গূঢ় সত্যের উদ্ঘাটনের কৃতিত্বে গল্পটি অনন্য হয়ে উঠেছে।

সতীনাথের ব্যঙ্গরসের গল্পগুলিতে তাঁর বিদ্রূপগর্ভ-বুদ্ধিপ্রদীপ্ত বাচনভঙ্গির ব্যবহারে গল্পগুলির উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই গল্পগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষাকে দ্বর্থ্যবোধক ভাবে ব্যবহার করেছেন। যেখানে ভাষার বাইরের অবয়বের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে লেখকের ভিন্নতর বক্তব্যের স্তর। গল্পের সংলাপগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে মান্যচলিত ভাষাকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহার করেছেন তেমনি তাঁর সঙ্গে কখনো কখনো সাধু ভাষা এবং বিহারের আঞ্চলিক ভাষা, এমনকি অন্যান্য বিদেশী ভাষার বা শব্দের সুপরিকল্পিত অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন মানুষের চরিত্রের অসঙ্গতিকে, জীবনের অসামঞ্জস্যকে প্রকাশ করতে।

সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন বহুভাষা জ্ঞানী। তিনি প্রায় দশের অধিক ভাষা বলতে লিখতে এবং পড়তে জানতেন। তাঁর এই ভাষাজ্ঞানের পরিচয় ফুটে উঠেছে ছোটগল্পগুলিতে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতীনাথ ছিলেন খুবই সচেতন। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পের ভাষা ব্যবহারের বিশ্লেষণে দেখা যায় উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত ভাবে বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্যান্য হিন্দি কিংবা আরবী কিংবা ফারসী ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গল্পের কাহিনী এবং চরিত্র উপস্থাপনে শিল্পরসকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা ভাষার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে গল্পগুলির উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে — তেমনি স্থানিক চিত্রও সঠিক ভাব-মূর্তিতে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। যেমন — 'আন্টাবাংলা' গল্পে ইংরেজ সাহেবদের মুখে বাংলা ভাষার প্রয়োগশৈলী যেমন সুন্দর এবং স্বপ্রযুক্ত হয়েছে তেমনি অশিক্ষিত বর্বর নেটিভ বিরসা বা বোট্‌রা ওঁরাওদের মুখের ভাষাও সম্পূর্ণ ভাবেই তাদের চরিত্রানুগ হয়েছে। এই গল্পে ব্যবহৃত শব্দগুলো যেমন ইংরেজ সাহেবদের মুখে 'বদমাশ' শব্দটির উচ্চারণ দিয়েছেন 'বডম্যাস',

আবার তেমনি বোট্‌রার মুখে শোনা যায় — 'তহশিলদার' শব্দটি 'তসিলদার' রূপে উচ্চারণ করতে। এছাড়াও এই গল্পের আরও বেশ কিছু শব্দের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য — 'জলদি', 'বোখার', 'ঝুটা', 'কাঁহাকা', 'নিমক', 'আওরাৎ', 'ইমান', 'ডিউর‍্যাণ্ডার', 'কাপ্তেন' প্রভৃতি। সতীনাথের বিভিন্ন গল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা এবং বিদেশী ভাষার শব্দ প্রয়োগের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল —

যেমন 'গণনায়ক' গল্পের 'মুনীমজী' শব্দটি হিন্দী শব্দ যার অর্থ — গোমস্তা। এছাড়া এই গল্পে ব্যবহৃত আরো বেশ কিছু হিন্দি এবং অন্যান্য বিদেশী শব্দ — 'বোরা' (চটের বস্তা) 'একঘন্টা ফাজিল রাখলাম' (এক ঘন্টা হাতে রাখলাম), 'বিজলী' (বিদ্যুৎ), 'শোকরিয়া' (ধন্যবাদ), 'হেপাজৎ' (দায়িত্বে), 'দিকদারি' (বিরক্ত), 'মোফিল' (জলসা), 'জিন্দা' (বাঁচা), 'মঝব' (সংস্কৃতি), 'জমি জরিৎ' (জমি-জমা), 'সাচ্চা' (খাঁটি), 'তাজ্জব' (অবাক), 'আমানত' (সম্পত্তি), 'বজ্জাতি' (বেয়াদপি), 'লে লিয়া হ্যাঁয়' (নিয়ে নিয়েছে), 'বাট গেয়া' (বিভক্ত হওয়া), 'সাচ্চা আদমী' (খাঁটি মানুষ), 'মছলী' (মাছ), 'ওয়াজিব' (উপযুক্ত), 'ফন্দিবাজ' (ধূর্ত), 'ছোকরা' (ছেলে) প্রভৃতি। 'চরণদাস এম. এল. এ.' গল্পে অ-বাংলা শব্দগুলি হল — 'নমস্তে', 'সাহাব', 'শাগরেদ', 'মোকদ্দমা', 'লোটা', 'নিমকহারাম', 'চাচী', 'আস্তিন', 'আওর', 'গোস্তাকি', 'নাস্তা', 'বেয়াদপ', 'খোদাহাফেজ', 'আশকারা', 'তোবা' প্রভৃতি। আবার 'পরকীয় সন-ইন-ল' গল্পে ব্যবহৃত অন্য ভাষার শব্দগুলি হল — 'পরকী দামাদ', 'হাকিম', 'আলবত', 'লছমী', 'নমস্তে', 'তুরংত', 'ঝাণ্ডা', 'দুশ্‌মন', 'ফিরসে', 'বম্বা', 'রেয়াজ' প্রভৃতি।

'চকাচকী' গল্পের -- 'ঠমক', 'লচক', 'তদবির', 'রামজী', 'ফুরসৎ', 'ছাপ্পর', 'খাপরা', 'খটিয়া', 'লোটা' প্রভৃতি এবং বন্যা গল্পের —'আস্তান', 'মড়র', 'খলিফা', 'উখ্‌লি', 'সামাট', 'চোট্ট', 'চৌকা', 'পুতহু', 'রইস', 'বহিন' প্রভৃতি শব্দগুলি বাংলা শব্দের পাশাপাশি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য গল্পেও এভাবে অন্য ভাষার শব্দ প্রয়োজন মাফিক ব্যবহৃত হয়েছে। আর সেই ব্যবহারে গল্পকার সতীনাথের গল্প নির্মাণ কৌশলের দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে বাক্ নির্মিতির আলোচনায় আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় — তা হল সতীনাথের উপমা এবং প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের অপূর্ব দক্ষতা এবং কৌশল। জীবনের নানাবিধ বিষয়কে বোঝাতে কিংবা পাঠকের কাছে কোন একটি বিষয়কে চমকপ্রদ করে পরিবেশন করতে সতীনাথ তাঁর ছোটগল্পে এমন কিছু উপমার ব্যবহার করেছেন যা বক্তব্য বিষয়কে যেমন স্পষ্ট করে তুলেছে, তেমনি লেখকের মননশীলতার গৌরবকেই অনন্যতায় প্রকাশ করেছে। আমরা সতীনাথের ছোটগল্পগুলিতে ব্যবহৃত বেশ কিছু উপমার উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি —

(i) ''বন্যার স্রোতের মত গালির স্রোত বইছে।''[২০২]

(ii) ''চড়চড়ে রোদ জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ লাগল আহ্লাদীর।''[২০৩]

(iii) ''মাছি ছোটে দূষিত ক্ষতের গন্ধ পেয়ে। নিবারণও চেষ্টা-তদ্‌বির করে বদলি হয়েছিল আজবপুর পোস্টাফিসে।''[২০৪]

(iv) ''অনেক সময় মাকড়সার মিহি জাল চোখে দেখা যায় না; অথচ যত সরিয়ে দিতে যাও, তত মুখচোখে আরও বেশি করে লেপটে বসে; সেই রকমের একটা অস্বস্তির অদৃশ্য জাল দুজনের মনের মধ্যে।''[২০৫]

(v) ''পুরুষ মানুষের এই রকম ফৌজি মেজাজই হওয়া উচিত আজকালকার দিনে।''[২০৬]

(vi) ''ভিত না হলে যেমন বাড়ি হয়না, বেড়া না হলে তেমনি বাগান হয় না।''[২০৭]

সাধারণ অলংকার বর্জিত ছোট ছোট বাক্যে জীবনের অভ্যন্তর থেকে উপমা নির্বাচন করে তাকে প্রয়োজন বিশেষে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে গল্পগুলির সৌন্দর্য-সুষমা অনেকাংশে বর্ধিত হয়েছে।

উপমার পাশাপাশি সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে আমরা বেশ কিছু প্রবাদ প্রবচনেরও সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। প্রবাদ বাস্তব জীবন নির্ভর। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জীবনকে নির্ভর করে জীবনের নানা ঘটনা সঙ্গতি-অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে কালে কালে গড়ে উঠেছে প্রবাদ। তেমনি সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ছোটগল্পে এমন কিছু বাক্যাংশ বা বাক্যখণ্ডের ব্যবহার করেছেন যেগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদ-প্রবচনের মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলিতে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনের কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল —

(i) ''চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।''[২০৮]

(ii) ''বাপ রাজা তো রাজার ঝি; ভাই রাজা তো বোনের কি।''[২০৯]

(iii) ''নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।''[২১০]

(iv) ''যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর?''[২১১]

(v) ''ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব!''[২১২]

(vi) ''আদেখলের ঘটি হল, জল খেতে খেতে বাছা মল।''[২১৩]

(vii) ''পাঁকে পড়লে ব্যাঙের লাথিও সইতে হয়।''[২১৪]

(viii)''এক হাতে তালি বাজেনা।''[২১৫]

(ix) ''কানে গুঁজেছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।''[২১৬]

(x) ''হাওয়া কেনার জন্য পয়সা খরচ।''[২১৭]

এক সাহিত্য সমালোচক বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব-বিকাশ-পরিচিতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন --- ''আবার মজা এই যে একজন কুশলী স্রষ্টা তাঁর দক্ষ পর্যবেক্ষণে এই সব হাটবাজার-রাস্তাঘাট-লোকালট্রেন-ক্লাশ রুম-করিডোর-কমনরুম থেকে অর্থাৎ যে কোনো জায়গা থেকেই

খুঁজে নিতে পারেন প্রকৃত গল্পের উপাদান। তারপর সেই উপকরণের সঙ্গে নিজস্ব বোধ বুদ্ধি বোধির সংযোগে জমে উঠতেই পারে গল্পকারের প্লট, সৃষ্টিধর্মী কল্পনার সংরাগে তিনি রচনা করে বসতেই পারেন এক নতুন সংরূপ। এক (বা একাধিক) সার্থক ছোট গল্প।" — [২১৮] সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে এই কথা সর্বৈব সত্য। সতীনাথ ছিলেন বিচিত্র সন্ধানী - বিচিত্রতার রূপকার। একই বিষয়ের চর্বিতচর্বণ বা বারংবার পুনরাবৃত্তি তাঁর স্বভাব-বিরোধী - তাঁর শিল্পী মানসের ধর্ম-বিরোধী। উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প সবক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যটি বর্তমান। চির নতুনের সন্ধানী শিল্পী তাই তাঁর সাহিত্য শিল্পের বাসরঘর রচনা করেছেন দৈনন্দিন জীবনের ছোট-বড় নানা ঘটনা, জীবনের কিছু চরম সত্য, কিছু বিশেষ সম্পর্ক আর ইতিহাসের দলিল থেকে তুলে আনা কিছু অপূর্ব ঘটনাবলী দিয়ে। তাঁর রচিত সাহিত্যে তাই অতি সাধারণ অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাঙালী কিংবা বিহারী জনগোষ্ঠীর লোকেদের জীবনযাত্রা সম্মানের সঙ্গে স্থান পেয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের বাক্ নির্মিতির আলোচনায় সার্বিক ভাবে যে কথাটি মনে রাখতে হয় তা হল, তাঁর ছোটগল্পগুলির প্রেক্ষাপট, পটভূমি, কাহিনী, চরিত্র সবই বিহারের নানা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। আর একথা বলা বাহুল্য যে, বিহারে জনমানসের অধিকাংশই কথা বলে তাদের মাতৃভাষা বিহারী বা বিহারের স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায়। আর তাই সতীনাথকে বিহারী এবং অবাঙালী জনজাতির জীবন চর্যা, চরিত্রকে নিয়ে বাংলা ছোটগল্প রচনা করতে গিয়ে তাদের মুখের সংলাপ রচনায় বেশ কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হয়েছে। কারণ বিহারী চরিত্রদের মুখে পুরোপুরি বাংলা সংলাপ বসিয়ে তিনি যেমন শিল্পরূপে বা বাক্ নির্মিতিতে কৃত্রিমতা আনতে চাননি, তেমনি আবার বাংলা ছোটগল্পেও কখনো পুরোপুরি বিহারের আঞ্চলিক ভাষা বা হিন্দি ভাষায় সংলাপ রচনাও সম্ভবপর নয়। তাই এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতেই সতীনাথ বেছে নিয়েছেন নিজের মত করে একটি দু-কুল রক্ষার উপায়। নিজের সৃষ্ট চরিত্রের সংলাপে কৃত্রিমতা এড়াতে, আবার বাংলা ছোটগল্পের বাঙালী পাঠকদেরও পড়বার অসুবিধা দূর করতে, তাদের কাছে চরিত্রগুলোর অপরিচিতির দুরূহ সংকটকে কাটাতে তিনি মূলত বাংলা ভাষায় বা শিষ্ট বোধগম্য চলিত ভাষায় এবং কখন কখন সাধু ভাষার অনুপ্রবেশে সংলাপ রচনা করে, তার মধ্যে মধ্যে বেশ কিছু বিহারের আঞ্চলিক শব্দ বা টুকরো টুকরো বাক্যকে ব্যবহার করে এই সঙ্গে বাস্তবতা এবং স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন। আর তাই চরিত্র-কাহিনী-ঘটনার উপস্থাপনে ভাষা বা সংলাপের যথোপযুক্ত ব্যবহারে সতীনাথের ছোটগল্পগুলির বাক্ নির্মিতি যেমন সার্থক হয়ে উঠেছে তেমনি শিল্পরসের দিক থেকেও অক্ষুণ্ণতা বজায় থেকেছে।

তথ্যসূত্র :

১। সতীনথ গ্রন্থাবলী-১, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'গ্রন্থপ্রসঙ্গ', পৃ. ৫০৪।

২। তদেব, 'গণনায়ক', পৃ. ২৬৮।

৩। তদেব, পৃ. ২৬৪।

৪। তদেব, পৃ. ২৬৩।

৫। তদেব, পৃ. ২৬৩।

৬। তদেব, পৃ. ২৬৪।

৭। তদেব, পৃ. ২৭৪।

৮। তদেব, পৃ. ২৮০।

৯। তদেব, পৃ. ২৮০।

১০। তদেব, পৃ. ২৮০।

১১। তদেব, পৃ. ২৬৭।

১২। তদেব, পৃ. ২৬৮।

১৩। তদেব, পৃ. ২৬৮।

১৪। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৩, সম্পদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'চরণদাস-এম-এল-এ', পৃ. ৩৩১।

১৫। তদেব, পৃ. ৩৩১।

১৬। তদেব, পৃ. ৩৩২।

১৭। তদেব, পৃ. ৩৩১।

১৮। তদেব, পৃ. ৩৩৩।

১৯। তদেব, পৃ. ৩৪০।

২০। তদেব, পৃ. ৩৪৩।

২১। তদেব, পৃ. ৩৪৪।

২২। তদেব, পৃ. ৩৪৪।

২৪। তদেব, 'পরকীয় সন-ইন-ল', পৃ. ৪১৩।

২৫। তদেব, পৃ. ৪১৩।

২৬। তদেব, পৃ. ৪১৩।

২৭। তদেব, পৃ. ৪২১।

২৮। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৪, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ', পৃ. ৪৪৬।

২৯। তদেব, পৃ. ৪৪৯।

৩০। তদেব, পৃ. ৪৫২।

৩১। তদেব, পৃ. ৪৪৭।

৩২। তদেব, পৃ. ৪৫৩।

৩৩। তদেব, 'আন্তর্জাতিক', পৃ. ৩৬৪।

৩৪। তদেব, পৃ. ৩৬৭।

৩৫। তদেব, পৃ. ৩৬৬।

৩৬। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'বন্যা', পৃ. ২৮২।

৩৭। তদেব, পৃ. ২৮২।

৩৮। তদেব, পৃ. ২৮৫।

৩৯। তদেব, পৃ. ২৮২।

৪০। তদেব, পৃ. ২৮৩।

৪১। তদেব, পৃ. ২৮৩।

৪২। তদেব, পৃ. ২৮২।

৪৩। তদেব, পৃ. ২৯৬।

৪৪। তদেব, পৃ. ২৮৩।

৪৫। তদেব, পৃ. ২৮৮।

৪৬। তদেব, পৃ. ২৮৭।

৪৭। তদেব, পৃ. ২৯৩।

৪৮। তদেব, পৃ. ২৯৫।

৪৯। তদেব, 'রথের তলে', পৃ. ৪০১।

৫০। তদেব, পৃ. ৪০২।

৫১। তদেব, পৃ. ৪০২।

৫২। তদেব, পৃ. ৪১০।

৫৩। তদেব, পৃ. ৪০৩।

৫৪। তদেব, পৃ. ৪১৯।

৫৫। তদেব, পৃ. ৪২২-৪২৩।

৫৬। তদেব, পৃ. ৪২৩।

৫৭। তদেব, পৃ. ৪২৪।

৫৮। তদেব, পৃ. ৪২৪।

৫৯। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৩, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য 'বয়োকমি', পৃ. ৪৪১।

৬০। তদেব, পৃ. ৪৪১।

৬১। তদেব, পৃ. ৪৪৩।

৬২। তদেব, পৃ. ৪৪৪।

৬৩। তদেব, পৃ. ৪৪৪।

৬৪। তদেব, পৃ. ৪৪৫।

৬৫। তদেব, পৃ. ৪৪৫।

৬৬। তদেব, 'কৃষ্ণকলি', পল. ৩০৬।

৬৭। তদেব, পৃ. ৩০৬।

৬৮। তদেব, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

৬৯। তদেব, পৃ. ৩০৫।

৭০। তদেব, পৃ. ৩০৮।

৭১। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য 'আন্টাবাংলা', পৃ. ৩০৯।

৭২। তদেব, পৃ. ৩০৮।

৭৩। তদেব, পৃ. ৩০৯।

৭৪। তদেব, পৃ. ২৯৮।

৭৫। তদেব, পৃ. ৩০৮।

৭৬। তদেব, পৃ. ৩১৫-৩১৯।

৭৭। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য 'চকাচকী', পৃ. ৩২১।

৭৮। তদেব, পৃ. ৩২১।

৭৯। তদেব, পৃ. ৩২১।

৮০। তদেব, পৃ. ৩২১।

৮১। তদেব, পৃ. ৩২২।

৮২। তদেব, পৃ. ৩২২।

৮৩। তদেব, পৃ. ৩২২।

৮৪। তদেব, পৃ. ৩২৭।

৮৫। তদেব, পৃ. ৩২৮।

৮৬। তদেব, পৃ. ৩২২।

৮৭। তদেব, পৃ. ৩২২।

৮৮। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৩, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য 'দাম্পত্য সীমান্তে', পৃ. ৩৪৬।

৮৯। তদেব, পৃ. ৩৪৬।

৯০। তদেব, পৃ. ৩৪৬।

৯১। তদেব, পৃ. ৩৪৬।

৯২। তদেব, পৃ. ৩৪৮।

৯৩। তদেব, পৃ. ৩৫৩।

৯৪। তদেব, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।

৯৫। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, সম্পাদক — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য 'পঙ্কতিলক', পৃ. ৩২০।

৯৬। তদেব, পৃ. ৩২২।

৯৭। তদেব, পৃ. ৩২৩।

৯৮। তদেব, পৃ. ৩৪১।

৯৯। তদেব, পৃ. ৩৪৮।

১০০। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৩, 'মহিলা-ইন-চার্জ', পৃ. ২৯৫।

১০১। তদেব, পৃ. ২৯৫।

১০২। তদেব, পৃ. ২৯৯-৩০০।

১০৩। তদেব, পৃ. ৩০১।

১০৪। তদেব, পৃ. ২৯৪।

১০৫। তদেব, 'পদাঙ্ক', পৃ. ৩৬১।

১০৬। তদেব, পৃ. ৩৬১।

১০৭। তদেব, পৃ. ৩৬৩।

১০৮। তদেব, পৃ. ৩৬২।

১০৯। তদেব, পৃ. ৩৬৭।

১১০। তদেব, পৃ. ৩৬৮।

১১১। তদেব, পৃ. ৩৬৫।

১১২। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, 'কমাণ্ডার-ইন-চীফ', পৃ. ৪১৬-৪১৭।

১১৩। তদেব, পৃ. ৪১৫।

১১৪। তদেব, পৃ. ৪১৪।

১১৫। তদেব, পৃ. ৪১৫।

১১৬। তদেব, 'পুতিগন্ধ', পৃ. ৪৯৬।

১১৭। তদেব, পৃ. ৪৯৬।

১১৮। তদেব, পৃ. ৪৮৯-৪৯০।

১১৯। তদেব, পৃ. ৪৯৩।

১২০। তদেব, পৃ. ৪৯০।

১২১। তদেব, পৃ. ৪৯৯।

১২২। সতীনাথ গ্রন্থবলী-১, 'অপরিচিতা', পৃ. ৩৬২।

১২৩। তদেব, পৃ. ৩৬২।

১২৪। তদেব, পৃ. ৩৬২।

১২৫। তদেব, পৃ. ৩৬৩।

১২৬। তদেব, পৃ. ৩৭২।

১২৭। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, 'ডাকাতের মা', পৃ. ৩৪৪।

১২৮। তদেব, পৃ. ৩৪৫।

১২৯। তদেব, পৃ. ৩৪৬।

১৩০। তদেব, পৃ. ৩৪৮।

১৩১। তদেব, পৃ. ৩৫১।

১৩২। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, 'ফেরবার পথ', পৃ. ৩৮৯-৩৯০।

১৩৩। তদেব, পৃ. ৩৯৫।

১৩৪। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, 'ধস', পৃ. ৫১৫-৫১৬।

১৩৫। তদেব, পৃ. ৫১৬।

১৩৬। তদেব, পৃ. ৫২৫-৫২৭।

১৩৭। তদেব, পৃ. ৫২৬-৫২৭।

১৩৮। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, 'ভূত', পৃ. ৩৪৯।

১৩৯। তদেব, পৃ. ৩৫৪।

১৪০। তদেব, পৃ. ৩৪৯।

১৪১। তদেব, পৃ. ৩৫১।

১৪২। তদেব, পৃ. ৩৫৬।

১৪৩। তদেব, পৃ. ৩৫৭।

১৪৪। তদেব, পৃ. ৩৫৭।

১৪৫। তদেব, পৃ. ৩৫৯-৩৬০।

১৪৬। তদেব, পৃ. ৩৬১।

১৪৭। তদেব, 'পরিচিতা', পৃ. ৩৭৪।

১৪৮। তদেব, পৃ. ৩৮০।

১৪৯। তদেব, পৃ. ৩৭৩।

১৫০। তদেব, পৃ. ৩৭৭।

১৫১। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, 'বৈয়াকরণ', পৃ. ৩৩০।

১৫২। তদেব, পৃ. ৩৩০।

১৫৩। তদেব, পৃ. ৩৩২।

১৫৪। তদেব, পৃ. ৩৩৯।

১৫৫। তদেব, পৃ. ৩৪০-৩৪১।

১৫৬। তদেব, পৃ. ৩৩২।

১৫৭। তদেব, পৃ. ৩৪৩।

১৫৮। তদেব, 'পত্রলেখার বাবা', পৃ. ৪০৮।

১৫৯। তদেব, পৃ. ৪০৮।

১৬০। তদেব, পৃ. ৪০১।

১৬১। তদেব, পৃ. ৪০২-৪০৩।

১৬২। তদেব, 'অভিজ্ঞতা', পৃ. ৫০৪।

১৬৩। তদেব, পৃ. ৫০৫-৫০৬।

১৬৪। তদেব, পৃ. ৫০৬।

১৬৫। তদেব, পৃ. ৫০৪।

১৬৬। তদেব, পৃ. ৫০৮।

১৬৭। তদেব, 'বিবেকের গণ্ডী', পৃ. ৩৫২।

১৬৮। তদেব, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

১৬৯। তদেব, পৃ. ৩৫৫।

১৭০। তদেব।

১৭১। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, সম্পাদনা — শঙ্খঘোষ, নির্মাল্য আচার্য 'অনাবশ্যক', পৃ. ৪৪১।

১৭২। তদেব, 'ঈর্ষা' পৃ. ৪৫৯।

১৭৩। তদেব, পৃ. ৪৫৯।

১৭৪। তদেব, পৃ. ৪৬০।

১৭৫। তদেব, পৃ. ৪৭৪।

১৭৬। তদেব, পৃ. ৪৭৮।

১৭৭। তদেব, পৃ. ৪৮০।

১৭৮। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৩, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচর্য, 'দুই অপরাধী', পৃ. ৩৫৩।

১৭৯। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৪, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য 'মা আম্রফলেষু', পৃ. ৪১৫।

১৮০। তদেব, পৃ. ৪২১।

১৮১। তদেব, পৃ. ৪২১।

১৮২। তদেব, পৃ. ৪২১-৪২২।

১৮৩। তদেব, পৃ. ৪২২।

১৮৪। তদেব, পৃ. ৪২২।

১৮৫। তদেব, পৃ. ৪২২।

১৮৬। তদেব, পৃ. ৪১৯।

১৮৭। তদেব, পৃ. ৪১৯-৪২০।

১৮৮। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৩, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'জোড়কলম', পৃ. ৪২৮।

১৮৯। তদেব, পৃ. ৪২৮।

১৯০। তদেব, পৃ. ৪৩০।

১৯১। তদেব, পৃ. ৪২৯।

১৯২। তদেব, পৃ. ৪৩১।

১৯৩। তদেব, পৃ. ৪৩৫।

১৯৪। তদেব, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬।

১৯৫। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৪, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচর্য, 'এক ঘন্টার রাজা', পৃ. ৪৩৬।

১৯৬। তদেব, পৃ. ৪৩৭।

১৯৭। তদেব, পৃ. ৪৩৭।

১৯৮। তদেব, পৃ. ৪৪৬।

১৯৯। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৩, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'হিসাব নিকাশ', পৃ. ৩৭৩।

২০০। তদেব, পৃ. ৩৮০-৩৮১।

২০১। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৪, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'জামাইবাবু', পৃ. ৩৫৭-৩৫৮।

২০২। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৩, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'মহিলা-ইন-চার্জ', পৃ. ৩০০।

২০৩। তদেব, 'বয়োকমি', পৃ. ৪৪১।

২০৪। তদেব, 'দাম্পত্য সীমান্তে', পৃ. ৩৪৬।

২০৫। তদেব, 'দুই আপরাধী', পৃ. ৩৫৮।

২০৬। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৪, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'সরমা', পৃ. ৪৬৩।

২০৭। তদেব, 'অজগড়', পৃ. ৩৮৯।

২০৮। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৪, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'বয়োকমি', পৃ. ৪৩৯।

২০৯। তদেব, পৃ. ৪৩৯।

২১০। তদেব, পৃ. ৪৪১।

২১১। তদেব, পৃ. ৪৪৩।

২১২। তদেব, 'কৃষ্ণকলি', পৃ. ৩০৬।

২১৩। তদেব, 'জাদুগণ্ডি', পৃ. ৩৯৩।

২১৪। তদেব, 'সরমা', পৃ. ৪৬৭।

২১৫। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ', পৃ. ৪১৫।

২১৬। তদেব, 'পুতিগন্ধ', পৃ. ৪৯০।

২১৭। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-৪, সম্পাদনা — শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য, 'আন্তর্জাতিক', পৃ. ৩৬২।

২১৮। গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে — হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবন্ধ-বাংলা ছোটগল্পের কাছে প্রত্যাশা, পৃ. ১৫।

——oo——